প্রেমে পড়ার সময়

ইমদাদুল হক মিলন

তোমাকে আমি কেমন করে পেলাম, জানো?

মনে মনে কথা বলবার সময় মনে হয়, আসলে মনে মনে কথা আমি বলছি না। বলছি যেন সত্যি করেই। আর শর্মি আমার পাশে আছে। হয়তো পাশাপাশি হাঁটছি আমরা, হাঁটতে হাঁটতে কথা বলছি।

এখন যেন বিকেল, শেষ বিকেল।

আর বেড়াতে এসেছি সবুজ ঘাসের বিশাল নির্জন কোন মাঠে। মাঠ পেরিয়ে অনেকখানি দূরে রূপোলি ফিতের মতো একটা নদী। সেই নদীর দিকে হেঁটে যাচ্ছি আমরা। ফুরিয়ে আসা বিকেল বেলার আলোয় দুজন ধরে আছি দুজনার হাত।

শর্মি যেন আজ পরেছে হালকা আকাশি রংয়ের শাড়ি। আমার পরনে জিন্স আর সাদা টিশার্ট। সুবজ ঘাসের মাঠে আমাদের দুজনকে ছবির মতো দেখাচ্ছে।

নদীর দিক থেকে আসা হাওয়ায় এলোমোলো হচ্ছে আমার চুল, শর্মির আঁচল।

কথা শুনে গ্রিবা বাঁকিয়ে আমার দিকে তাকাল শর্মি। তার সেই অসাধারণ গজদাঁত বের করে হাসল। কেমন করে পেলে?

ঘটনাটা অদ্ভুত।

আহা বলোই না।

দেশে ফেরার চার পাঁচদিন পরের কথা। কী কারণে ভাইয়ার রুমে ঢুকেছি, দেখি ভাইয়া নেই। ফিরে আসছি, হঠাৎ চোখ পড়ল তার বেডসাইডের দিকে। সেখানকার মেঝেতে সাদা একটা খাম পড়ে আছে। ভাবলাম জরুরি কিছু হবে, তুলে রাখি।

তুলতে গেছি, টুক করে দুটো ছবি বেরোলো খাম থেকে, সঙ্গে একটা কাগজ। কিছু না ভেবেই ছবির দিকে তাকিয়েছি। একই মেয়ের দুটো ছবি, একটা নীল রঙয়ের সেলোয়ার কামিজ পরা আরেকটা ফিরোজা রঙয়ের শাড়ি। কিন্তু কী যে সুন্দর মেয়ে সে। ছবির মতো, একেবারে ছবির মতো। শাড়ি পরা ছবিটায় হাসছে সে। গজদাঁত দেখা যাচ্ছে। মানুষের হাসি যে এতো সুন্দর হতে পারে ওই ছবি না দেখলে, পরে আসল মানুষটিকে না দেখলে আমার তা জানা হতো না।

শর্মি আবার মুগ্ধ চোখে আমার দিকে তাকাল। তারপর?

সেই মেয়ের ছবি দেখে আমার কী রকম যেন একটা ঘোর লেগে গেল– কে সে? তার ছবি ভাইয়ার রুমে কেন? সঙ্গের কাগজটিতে কী লেখা আছে?

কাগজটা খুলেছি। সেটা মেয়েটির বায়োডাটা।

তার মানে কি চাকরি বাকরির ব্যাপার!

ধুৎ! আমি আসলে একটা গাধা। চেহারা এবং বায়োডাটা যা দেখছি, এই মেয়ে চাকরি-বাকরি করার মেয়ে না। আর করলেও সে চাকরি দেয়ার লেভেলের মানুষ আমার ভাইয়া না।

তাহলে?

মুহূর্তে বুঝে গেলাম, বিবাহ কেস। বিয়ের জন্য পাত্রপক্ষকে পাঠানো হয়েছে এই খাম।

তার মানে ভাইয়া কি পাত্রপক্ষ!

আমার শরীরে অদ্ভুত এক রোমাঞ্চ হলো।

ভাইয়া পাত্রপক্ষ হলে পাত্রটা কে?

আমি!

কিন্তু আমি জীবনে বিয়ে করব না একথা ভাইয়া ভাবী আমার তিনবোন সবাই জানে। তাছাড়া আমার এখন আটত্রিশ ঊনচল্লিশ বছর বয়স। এই বয়সে বিয়ে! তাও এমন ফুটফুটে অসাধারণ সুন্দর এক যুবতী! বায়োডাটা যা দেখলাম, ওদের তো আমার মতো পাত্রের ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড হওয়ার কথা না।

ভাইয়াকে জিজ্ঞেস করব?

ভাবীকে?

নাকি দুই একদিন ওয়েট করে বুঝবার চেষ্টা করবো ব্যাপারটা আসলে কী? ছবির খামটা কি জায়গা মতো রেখে চলে যাব?

ওই যে বললাম ততোক্ষণে আমার মধ্যে তৈরি হয়েছে অদ্ভুত এক ঘোর। ছবির দিক থেকে চোখ সরাতে পারছি না আমি। ছবি রেখে চলে যেতে পারছি না। মনে হচ্ছে খামে ভরে ফেললেই যেন মানুষটি আমার কাছ থেকে হারিয়ে যাবে।

তাকে আর কোথাও খুঁজে পাব না আমি। যেমন একদিন আমার জীবন থেকে হারিয়ে গেছে আমার সব চেয়ে প্রিয় মানুষ, আমার বাবা। খামে রাখা ছবির মানুষটিও বুঝি তেমন করেই হারিয়ে যাবে, তাকে আমি আর খুঁজে পাব না।

খামটা বুক পকেটে ভরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম আমি।

শর্মি আবার বলল, তারপর?

তারপর থেকে ছবি বুকে নিয়ে ঘুরি। যখন তখন ছবি বের করে তার দিকে তাকিয়ে থাকি। মনে মনে কথা বলি। নিজের অজান্তেই যেন প্রেমে পড়ে যাচ্ছি সেই মেয়ের। শুধু মনে হয়, তোমাকে আমার চাই। তোমাকে আমার চাই। তোমাকে ছাড়া জীবনের একটি মুহূর্তও আর চলবে না আমার।

কিন্তু সেই রাতেই বেশ বড় একটা ধাক্কা আমি খেলাম।

শর্মি বলল, কী রকম?

আমি আসার পর রাতের খাবার আমাকে ছাড়া খান না ভাইয়া। যেখানেই থাকি না কেন, রাতের খাবারের সময় বাড়িতে আমাকে থাকতেই হবে। ভাইয়ার সঙ্গে খেতে বসতেই হবে।

সেই রাতেও বসেছি। ভাইয়া ভাবী, তাদের ছেলেমেয়ে দুটি আর আমি।

হঠাৎ ভাইয়া ভাবীকে বললেন, একটা খাম খুঁজে পাচ্ছি না।

ভাবী বললেন, কিসের খাম?

সাদা একটা খাম। ভেতরে শর্মির দুটো ছবি আর বায়োডাটা ছিল।

আমার ভাবী একটু অন্যমনস্ক ধরনের মানুষ। সহজে কারো নাম মনে রাখতে পারেন না। বললেন, শর্মি কে?

চিনি তো।

তাহলে জিজ্ঞেস করলে যে!

ভাবী লাজুক হাসলেন। মানুষের নাম আমি ভুলে যাই।

ভাইয়ার মেয়েটা ছোট। নাম মৌটুসি। বেস ঠোঁটকাটা এবং ফাটাফাটি কথা বলা মেয়ে। বলল, আম্মু, তোমার নিজের নামটা মনে আছে না ভুলে গেছ?

ভাবী চোখ পাকিয়ে তার দিকে তাকালেন। তুই চুপ কর।

ছেলেটির নাম শাওন। সেও বোনের সঙ্গে তাল মেলালো। আমরা তোমার পরীক্ষা নিচ্ছি। বলো তো তোমার পুরো নাম কী?

ছেলেকেও শাসালেন ভাবী। একটা থাপ্পড় মারবো।

আমি বললাম, তবে আমার সবার নাম মনে থাকে। ভাবীর পুরো নাম মোছাম্মৎ আফরোজা আক্তার শিলা।

মৌটুসি বলল, মোছাম্মৎটা কী?

ভাইয়া বললেন, কী শুরু করলি তোরা? আমি একটা খাম খুঁজে পাচ্ছি না, আর তোরা...

ভাবী বললেন, শর্মির ছবি বায়োডাটা তোমাকে দিয়েছিল কেন?

আমি ততোক্ষণে মাথা নিচু করে ফেলেছি। বুকটা ধুগ ধুগ ধুগ ধুগ করছে এক্ষণি ভাইয়া বলবেন বিয়ের ব্যাপার। মাহীর একটু বয়স হয়েছে তাতে কী! বিদেশে থাকা ছেলে। তাও জার্মানীর মতো দেশে। শুনে জাহিদ সাহেব তার মেয়ের ছবি বায়োডাটা পাঠিয়েছেন।

শুনে ভাবী হয়তো বলবেন, মাহীর জন্য চেষ্টা করে লাভ কী? ও তো বিয়ে করবে না।

কিন্তু এই মেয়ে হলে বিয়ে তো আমি করবোই, সারা জীবন তার ছায়া হয়ে থাকব। দরকার হলে বিদেশের জীবন ফেলে এদেশে চলে আসব। দরকার হলে তাকে নিয়ে গাছতলায় থাকব। তবু তাকে আমার চাই।

তখুনি এমন এক কথা ভাইয়া বললেন, শুনে মনে হলো, মেঘলা আকাশের তলা দিয়ে হাঁটছিলাম আমি, এসময় বাজ পড়েছে মাথায়, নিঃশব্দে মরে গেছি আমি। ভাইয়া ভাবী আর তাদের ছেলেমেয়ের সঙ্গে রাতের খাবার খেতে বসেছে যে মানুষটি সে আসলে মৃত। বেঁচে নেই।

ভাবীর দিকে তাকিয়ে ভাইয়া বললেন, তুমি বড় অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্ন করো। তোমার সামনেই না সেদিন তোমার বড়'পা বললেন গালিবের জন্য মেয়ে দেখতে। তুমিই না বললে জাহিদ সাহেবের মেয়ে শর্মি খুব সুন্দর। গালিবের সঙ্গে খুব মানাবে। আমাকে কথা বলতে বললে!

মৌটুসি হাসতে হাসতে বলল, আম্মু এখন বলবে, গালিবটা যেন কে? শোন আম্মু, আমি বলছি। গালিব ভাইয়া বড়খালার ছেলে

সবাই হাসতে লাগল।

আমার ততক্ষণে হাত পা কাঁপছে। শুধু মনে হচ্ছে আমার মানুষটিকে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে গালিব নামের একজন মানুষ। সে আমার শত্রু। তাকে আমি দেখে নেব। যেমন করে একদিন দেখে নিয়েছিলাম আলমগীর মামাকে। যেমন করে দেখে নিয়েছিলাম সেলিম গুণ্ডাকে।

ভাইয়া বললেন, কিন্তু খামটা কোথায় হারালো বলো তো?

ভাবী বললেন, রেখেছিলে কোথায়?

বেডসাইডে।

ওদিকেই কোথাও তাহলে পড়েছে।

না পড়েনি। আমি তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি।

কিন্তু ঘর থেকে জিনিসটা যাবে কোথায়?

বুঝতে পারছি না। কী রকম একটা লজ্জার ব্যাপার হলো বলো তো?

লজ্জার ব্যাপার কেন?

বড়পাকে বলেছি মেয়ের ছবি বায়োডাটা পাঠাবো, জাহিদ সাহেবের কাছ থেকে চেয়ে আনলাম...

হারিয়ে গেছে এখন কী করবে বলো।

জাহিদ সাহেবকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলে আরেকটা ছবি বায়োডাটা আনো।

তাই করতে হবে।

আমি তখন আর খেতে পারছি না। গলা দিয়েও খাবার নামছে না। শুধু মনে হচ্ছে আমার বুকের ভেতর হাত ঢুকিয়ে খামছে ধরেছে আমার হৃদয়।

সেই শত্রুকে আমার এক্ষুণি শেষ করা দরকার। এক্ষুণি উচিত গালিবদের বাড়িতে ছুটে যাওয়া, গিয়ে তাকে বলা, খবরদার, শর্মির দিকে তুমি চোখ তুলে তাকাবে না। তাকালে তোমার চোখ আমি তুলে ফেলবো। শর্মি শুধু আমার। আমার।

ততক্ষণে যেন নদীটির কাছাকাছি চলে এসেছি আমরা।

শর্মি বলল, তারপর?

তারপর থেকে তোমাকে আমি খুঁজতে শুরু করেছিলাম। ইউনিভার্সিটিতে, তোমার ডিপার্টমেন্টে, এসে তোমাকে আমি খুঁজতে শুরু করেছিলাম।

একদিন।

দু'দিন।

তিনদিন।

তিনদিনের দিন তোমাকে আমি পেয়ে গেলাম। তারপর থেকে আমি তোমার পাশে ছায়ার মত। তুমি ছাড়া এখন আর আমার কোনো ভাবনা নেই, চিন্তা নেই, স্বপ্ন কিংবা কাজ কোনোটাই নেই।

রিকশাঅলা মৃদুগলায়, ডাকল, সাহেব।

আমার সাড়া নেই।

লোকটি আবার ডাকল, ও সাহেব।

এই ডাকটি শুনতে পেলাম। মুহূর্তে কল্পনার সেই নদীতীর থেকে শর্মির হাত ছেড়ে ফিরে এলাম বাস্তবে। কী হয়েছে?

কই যাইবেন, কন?

বললাম না ঢাকা ইউনিভার্সিটি।

ইনভারসিটি তো আইসা পড়ছি।

তাই নাকি !

এই প্রথম জায়গাটা আমার চোখে পড়ল, জায়গাটা আমি চিনতে পারলাম। টিএসসি ছাড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছে রিকশা। বললাম, রাখো। এখানেই নামব।

শর্মি আজ খুব সুন্দর একটা শাড়ি পরেছে।

হালকা আকাশি রংয়ের টাঙ্গাইলের সূতিশাড়ি। সকালবেলা গোসল করে শাড়ি পরার ফলে অপূর্ব লাগছে তাকে। যেন এইমাত্র ফুটে ওঠা এক গোলাপ।

ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল শর্মি। তার চুল খুব ঘন। সহজে শুকাতে চায় না। হেয়ার ড্রাইয়ার দিয়ে চুল শুকালো শর্মি। মাথার পেছন দিকে চুলগুলো গোছা করে তুলে ফুলের মতো একটা পাঞ্চক্লিপ দিয়ে আটকালো। তারপর হালকা করে গাঢ় খয়েরি রংয়ের লিপস্টিক লাগালো, বেশ মিষ্টি ধরনের একটি পারফিউম স্প্রে করলো। পারফিউমের গন্ধে তার শরীর এবং রুম দুটোই ভরে গেল। সুন্দর সাজ এবং গন্ধে মন ভাল হয় মানুষের। শর্মির একটু বেশি হলো। ড্রেসিং টেবিলের লম্বা আয়নার দিকে তাকিয়ে সে মনে মনে বলল, এই সাজ তুমি আজ কাকে দেখাবে?

সঙ্গে সঙ্গে একজন মানুষের কথা মনে পড়ল শর্মির। কয়েকদিন ধরে তার পিছু নিয়েছে। যখনই ইউনিভার্সিটিতে এসে নিজের ডিপার্টমেন্টের দিকে যায়, সিঁড়ির একপাশে উদাস হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাকে। ক্লাস থেকে বেরিয়ে সামনের বারান্দায় দেখে দাঁড়িয়ে আছে। বন্ধুদের সঙ্গে টিএসসিতে যাওয়ার সময় দুদিন হলো শর্মি খেয়াল করছে দূর থেকে মানুষটা তাকে ফলো করছে। পাঁচফিট সাত-আট ইঞ্চি লম্বা হবে। উত্তম কুমার টাইপের গোলগাল মুখ। মাথার চুল পাতলা ধরনের, চেহারা এবং স্বাস্থ্য দুটোই মোটামুটি। ফেডেড জিনসের স্কিনটাইট প্যান্ট পরে থাকে, পায়ে খয়েরি রংয়ের বুট। বেশিরভাগ দিনই গায়ে থাকে লুজ ধরনের হাফস্লিভ শার্ট। চোখেমুখে অদ্ভুত এক বিষণ্নতা। আর বেশ সিগ্রেট খায়। যতবারই তাকে দেখেছে শর্মি, হাতে সিগ্রেট আছে।

কিন্তু এখনও পর্যন্ত মানুষটার কথা শর্মি কাউকে বলেনি। ক্লাসের বন্ধুবান্ধব কাউকে না। মানুষটা যেমনি তাকে দেখছে সেও যেন তেমনি করেই দেখছে তাকে। তারপর কোনও একদিন হয়তো তার সামনে গিয়ে দাঁড়াবে। চোখের দিকে তাকিয়ে সরাসরি জিজ্ঞেস করবে, আপনার ব্যাপারটা কী? আমার পিছু নিয়েছেন কেন? কী চান?

আজ সকালে কি সেই মানুষটার কথা ভেবেই আকাশি রংয়ের শাড়ি পরল শর্মি! সুন্দর করে সাজল কি তার কথা ভেবেই!

ধুৎ!

শর্মি লজ্জা পেয়ে গেল! সে আমার কে যে তার জন্য আমি সাজব! আমি সেজেছি আমার জন্য। এই সাজ আমি এখন বাবাকে দেখাব, নীলুফুফুকে দেখাব।

নিজের রুম থেকে বেরিয়ে বাবার রুমে এল শর্মি। কিন্তু বাবা রুমে নেই, তাঁর রুমের সঙ্গে যে চওড়া সুন্দর বারান্দা সেই বারান্দায় মন খারাপ করা ভঙ্গিতে বসে আছেন। শর্মি এসে তাঁর পাশে দাঁড়াল। বাবা।

মুখ ফিরিয়ে মেয়ের দিকে তাকালেন জাহিদ সাহেব। মন খারাপ ভঙ্গিটা কেটে গেল তাঁর। মুগ্ধগলায় বললেন, বাহ্। খুব সুন্দর লাগছে।

কিন্তু তোমার কী হয়েছে?

জাহিদ সাহেব একটু থতমত খেলেন। কী হবে? কিছু হয়নি!

নিশ্চয় হয়েছে। কাল বিকেল থেকে তোমাকে খুব অন্যমনস্ক দেখছি। এখনও কী রকম মন খারাপ করে বসে

আছো।

জাহিদ সাহেব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। কারণটা বুঝিসনি?

বাবার কাঁধে হাত দিল শর্মি। বুঝব না কেন? মার মৃত্যুদিন ছিল কাল।

জাহিদ সাহেব মাথা নাড়লেন। এই সেদিনের কথা, দেখতে দেখতে সাত বছর হয়ে গেল।

শর্মি কথা বলল না, মুখ তুলে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল।

এই বাড়িটা উত্তরার পশ্চিমে, অনেকখানি ভেতরের দিকে। বাড়ির সঙ্গে নির্জন ধরনের একটা রাস্তা। রাস্তার পশ্চিমপাশে লেক। লেকের পাড়ে সবুজ ঘাসের মাঠ আর নানা রকমের গাছ, ফুল, পাতাবাহারের ঝোঁপঝাড়। লেকের ওপারেও এপারের মতোই দৃশ্য। ছবির মতো সুন্দর সুন্দর বাড়ি, গাছপালা। এসবের ওপর সকালবেলার আকাশ আজ রোদে ভেসে যাচ্ছে। বসন্তকালের মনোরম একটা হওয়া বইছে হু হু করে।

জাহিদ সাহেব আপন মনে বললেন, সময় যে কী দ্রুত কেটে যায়! তুই তখন মাত্র কলেজে ভর্তি হয়েছিস আর এখন ইউনিভার্সিটির শেষ ক্লাসে। কয়েক মাস পর পরীক্ষা। লেখাপড়ার জীবন শেষ হয়ে যাবে তোর।

শর্মি বাবার দিকে তাকাল। এরকমই তো হওয়ার কথা। সাত বছর কি কম সময়, তারপরও তো সেশনজটের মধ্যে পড়েছিলাম, নয়তো আরও আগেই পড়াশুনা শেষ হতো আমার।

হাত বাড়িয়ে মেয়ের একটা হাত ধরলেন জাহিদ সাহেব। আজ কি তোর ইউনিভার্সিটি খোলা?

শর্মি হাসল। খোলা থাকবে না? হঠাৎ করে ইউনিভার্সিটি বন্ধ হবে কেন?

জাহিদ সাহেব যেন একটু লজ্জা পেলেন। তাইতো! কখন যাবি?

এই তো কিছুক্ষণ পর। দেখছ না আমি রেডি!

জাহিদ সাহেব হাসলেন। দেখছি।

তুমি অফিসে যাবে না?

না।

শুনে খুশি হয়ে গেল শর্মি। তাহলে আমি গাড়ি নিয়ে চলে যাই। ইউনিভার্সিটিতে নেমে গাড়ি ছেড়ে দেব।

জাহিদ সাহেব আনমনা গলায় বললেন, না দিলেও অসুবিধা নেই। আমি আজ কোথাও যাব না।

না বাবা, তারপরও ছেড়ে দেব। ইউনিভার্সিটি এলাকায় গাড়ি রাখা খুব রিসকি। কখন কী গণ্ডগোল লাগবে, আমাদের গাড়িটা পাবে হাতের কাছে, দেখা গেল ওটার ওপর দিয়েই যাচ্ছে সব।

একটু থেমে শর্মি বলল, আমি তাহলে বেরোই।

মাত্র পা বাড়িয়েছে শর্মি, জাহিদ সাহেব বললেন, শোন।

শর্মি ঘুরে দাঁড়াল। বলো।

তোর কি খুব জরুরি কোনও ক্লাস আছে আজ?

না তেমন জরুরী কিছু নেই। কেন?

তাহলে যাবার দরকার কী?

শর্মি অবাক হলো, কেন বাবা?

বাড়িতেই থাক। সারাদিন বাপ-মেয়ে গল্প করি।

তখন আবার সেই মানুষটার কথা মনে পড়ল শর্মির। আজও সে নিশ্চয় আসবে। ইউনিভার্সিটিতে না গেলে শর্মিকে সে দেখতে পাবে না। আকাশি রংয়ের শাড়িতে শর্মিকে দেখলে আজ তার মাথা নিশ্চয় আরও বেশী খারাপ হবে। মুখের ভঙ্গিটা তখন কেমন হবে তার, উদাস বিষণ্ন থাকবে নাকি একটু উজ্জ্বল হবে! চোখের তারা কি কেঁপে উঠবে তার নাকি স্থির হবে! পলক কি পড়বে না চোখে!

বাবার কথায় ইউনিভার্সিটিতে না গেলে এসবের কোনও কিছুই আজ ঘটবে না। কোনও কিছুই আজ দেখা হবে না শর্মির।

কিন্তু বাবা কখনও এভাবে বলেন না। তিনি একটু সিরিয়াস ধরনের মানুষ। মেয়ের লেখাপড়ার ব্যাপারে যেমন, নিজের ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারেও তেমন। ফাঁকিজুকি, অলসতা– এসব তাঁর চরিত্রে নেই। শর্মিকেও তিনি তাঁর মতো করেই তৈরী করেছেন। শর্মির চরিত্রে মায়ের প্রভাব বলতে গেলে নেইই, প্রভাব যা সবই বাবার।

সেই বাবা আজ নিজে অফিসে যাচ্ছেন না, শর্মিকেও ইউনিভার্সিটিতে যেতে মানা করছেন, নিশ্চয় তার মন খুব বেশি খারাপ। আজ সারাদিন মেয়ের সঙ্গ চাচ্ছেন তিনি। শর্মির কি উচিত না বাবাকে সঙ্গ দেয়া! একদিন ইউনিভার্সিটিতে না গেলে কী এমন ক্ষতি হবে! এমন কোনও জরুরী ক্লাসও তার নেই। শুধু ওই ব্যাপারটা। ওটাই বা কী এমন ব্যাপার! আজ না হোক কাল দেখা তো তার সঙ্গে হবেই। এই আকাশি রংয়ের শাড়ি আরেকদিন না হয় পরবে শর্মি।

বাবার রুমের সঙ্গের বারান্দাটা বেশ চওড়া, সুন্দর। রেলিংয়ের ধারে ধারে টবে রাখা নানারকমের গাছপালা। একপাশে তিনটি বেতের চেয়ার, ছোট্ট একটা টেবিল। বিকেলে, সন্ধ্যায়, কখনও কখনও রাতে কিংবা ছুটিছাটার দিনে এখানটায় মা-বাবার সঙ্গে শর্মিও বসেছে অনেকদিন। কত গল্প-গুজব, হাসি-আনন্দ। মা মারা গেলেন, সেই হাসি-আনন্দের দিন উধাও হয়ে গেল জীবন থেকে।

এখন একা একা বাবা বসে থাকেন কোনও কোনও বিকেলে, সন্ধ্যায় কিংবা রাতে। বাবার সঙ্গে শর্মিও বসে কোনও কোনও সময়।

কিন্তু ওয়ার্কিংডেতে সকালবেলা বাবা বসে আছেন বারান্দায়, শর্মিকে ইউনিভার্সিটিতে যেতে মানা করছেন, এটা সত্যি একটা রেয়ার ঘটনা।

চেয়ার টেনে বাবার মুখোমুখি বসল শর্মি। আবার সেই প্রশ্নটা করল। তোমার কী হয়েছে বাবা?

জাহিদ সাহেব বিষণ্ন মুখে হাসলেন। বললাম না কিছু হয়নি। তোমার মায়ের মৃত্যুদিন ছিল...

বাবার কথা শেষ হওয়ার আগেই শর্মি বলল, না, আমার মনে হয় শুধু এটাই কারণ না। অন্য কোনও কারণ আছে। নয়তো তোমার মতো লোক অফিসে যাচ্ছে না, আমাকেও ইউনিভার্সিটিতে যেতে দিচ্ছ না, বলছ আমার সঙ্গে গল্প করে দিনটা কাটাবে, এসব তোমার চরিত্রের সঙ্গে একেবারেই বেমানান।

বেমানান কাজও কখনও কখনও করতে হয়। নয়তো জীবন বড় একঘেঁয়ে লাগে।

আমাদের জীবনটা একটু একঘেঁয়েই বাবা।

কী রকম?

মোবারক আর মোবারকের মাকে নিয়ে সংসারে পাঁচজন মাত্র মানুষ আমরা। তুমি আমি আর নীলুফুফু। তুমি আছ তোমার বিজনেস নিয়ে, আমি আমার পড়াশুনা, বুয়া আর মোবারককে নিয়ে ফুফু সামলাচ্ছে সংসার। সকালবেলা তুমি আর আমি দুজন চলে যাই দুদিকে। সন্ধ্যার আগে দুজনের আর দেখাই হয় না।

তোর মা বেঁচে থাকতেও তো এমনই ছিল সংসারের চেহারা। এখন নীলু যেভাবে সংসার চালাচ্ছে তোর মাও সেভাবেই চালাতেন। সকালবেলা তখনও তুই আর আমি দুজন দুদিকে চলে যেতাম।

তারপরও এতটা একঘেঁয়েমি সংসারে ছিল না। মা খুবই আমুদে ধরনের মানুষ ছিলেন। প্রায়ই আমাদের নিয়ে এদিক-ওদিক বেড়াতে যেতেন। এই আত্মীয় বাড়ি, ওই আত্মীয় বাড়ি। লতায়-পাতায় আত্মীয়রাও বিয়ে-শাদির

দাওয়াত দিলে ভাল একটা গিফট নিয়ে চলে যেতেন। তুমি আমি দু'জনেই খুব বিরক্ত হতাম। কিন্তু মা তবু যেতেন।

মনের দিক দিয়ে সে খুবই ভাল মানুষ ছিল।

মা বেঁচে থাকতে বছরে দু'তিনবার ঢাকার বাইরেও যাওয়া হতো আমাদের। কক্সবাজার, চিটাগাং, রাঙামাটি, সিলেট। একবার কক্সবাজার থেকে মহেশখালি চলে গেলাম। একবার বর্ষাকালে সিলেট গিয়ে তুমুল বৃষ্টিতে জাফলং, তামাবিল চলে গেলাম। তোমার মনে আছে, বাবা?

কেন থাকবে না! সব মনে আছে।

শর্মি তারপর আচমকা বলল, চা খাবে?

খেতে পারি। নাশতার পর একবার খেয়েছি। এখন আরেকবার খেলে ভালই লাগবে।

শর্মি উঠল। বলে আসি।

ছুটে কিচেনের দিকে চলে গেল শর্মি। যেভাবে গেল মুহূর্তে ঠিক সেভাবেই ফিরে এল। নিজের চেয়ারে বসে উচ্ছ্বসিত গলায় বলল, মহেশখালিতে গিয়ে আমরা যে খুব মজা করেছিলাম, সে কথা তোমার মনে আছে বাবা?

কেন থাকবে না?

তাহলে বলো তো মহেশখালিতে যাওয়ার এরেঞ্জম্যান্টটা কে করেছিল?

জাহিদ সাহেব হাসলেন। আমি কিন্তু ভুলিনি।

বাবাকে হাসতে দেখে শর্মিও হাসল। ভুলেছ কি না পরীক্ষা হোক।

তালেব।

রাইট। তালেব আংকেল।

সেবারের পুরো এরেঞ্জম্যান্টটাই তালেব করেছিল। শৈবালে সুইট বুক করা হিমছড়ি যাওয়া, মহেশখালি যাওয়া, সব। তালেবদের বাড়িই তো কক্সবাজার শহরে এবং সে খুব স্মার্ট লোক।

গানও খুব ভাল গায়।

জাহিদ সাহেব অবাক হলেন। তালেবের গানের কথা তোর মনে আছে?

বারে, থাকবে না! একরাতে তালেব আংকেলদের বাড়িতে আমাদের দাওয়াত ছিল। রিতা নামে তালেব আংকেলদের এক কাজিন খুব সুন্দর রান্না করেছিল। রূপচাঁদা ফ্রাই, সিদ্ধডিমের একটা আইটেম, কি কি সব সামুদ্রিক মাছ, সুঁটকি। সেইরাতে গিটার বাজিয়ে গান গেয়েছিলেন তালেব আংকেল। এতসব আমার মনে আছে কেন, জানো বাবা?

কেন বল তো?

সেদিন আকাশে বিশাল চাঁদ ছিল। আমরা কক্সবাজারে গিয়েছিলাম পূর্ণিমা রাতের সমুদ্র দেখতে।

আইডিয়াটা তোরই ছিল। ওইটুকু বয়সেই চাঁদ খুব পছন্দ করতে শুরু করেছিলি তুই। চাঁদ, জ্যোৎস্না এসব দেখলে মাথা খারাপ হয়ে যেত তোর।

এখনও যায়। আর সেদিন প্রথম গানটা চাঁদ নিয়েই গেয়েছিলেন তালেব আংকেল। পুরনো দিনের গান। সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের, এখনও আকাশে চাঁদ ওই জেগে আছে। চাঁদের কারণেই বোধহয় সবকিছু এত পরিষ্কার মনে আছে আমার।

তবে তালেব আংকেল খুবই আন্তরিক ধরনের লোক। আমার জন্য জানটা একেবারে দিয়ে দেয়।

তারপরও মহেশখালি যাওয়ার দিন তালেব আংকেলের সঙ্গে তুমি খুব বাজে বিহেভ করেছিলে। জাহিদ সাহেব খুবই অবাক হলেন। তাই নাকি?

হ্যাঁ। কেন, তোমার মনে নেই?

না একদম মনে নেই। কি করেছিলাম বল তো?

যে ঘাট থেকে মহেশখালি যাওয়ার কথা সেই ঘাটে যেন আগেই স্পিডবোট ঠিক করে রাখেন তালেব আংকেল ...শর্মির কথা শেষ হওয়ার আগেই চা নিয়ে এল মোবারকের মা। বাপ-মেয়ের মাঝখানকার টেবিলে কাপ দু'টা নামিয়ে রেখে চলে গেছে।

জাহিদ সাহেব চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, এখন তালেবের ওপর রাগের কারণটা মনে পড়ছে। ওকে বলেছিলাম ভাল একটা স্পিডবোট রিজার্ভ করে রাখতে। সকালবেলা আমাদেরকে মহেশখালি পৌঁছে দিয়ে আসবে বিকালবেলা গিয়ে আবার নিয়ে আসবে। ভাড়া যা হয় নেবে। ও সেটা করেনি।

শর্মিও তার চায়ে চুমুক দিল। আরে না, করেছিল। স্পিডবোটঅলাটা ছিল ধান্দাবাজ। অন্য কে একজন বেশি পয়সা অফার করেছে, তাকে নিয়ে চলে গেছে।

ও হ্যাঁ, তাই। মনে পড়েছে।

তালেব আংকেল কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আরেকটা বোট ঠিক করে ফেলেছিল। সমুদ্রের ওপর দিয়ে চমৎকার একটা জার্নি হলো আমাদের।

চায়ে চুমুক দিয়ে একটু উদাস হলেন জাহিদ সাহেব। দূরাগত গলায় বললেন, মহেশখালি জায়গাটা বিখ্যাত আদিনাথের মন্দিরের জন্য। পাহাড়ের অনেক উপরে গাছপালা ঘেরা চমৎকার একটা পরিবেশে মন্দির। বহু বহুকালের পুরনো মন্দির। বেশ কষ্ট করে উঠতে হয়। সেই মন্দির দেখে তোর মা যে কি খুশি হয়েছিলেন।

পুরনো দিনের মন্দির-টন্দির খুবই পছন্দ করতেন মা। ফেরার সময় সীতাকুণ্ডের চন্দ্রনাথ পাহাড়ে উঠেছিলাম আমরা। সেই মন্দির দেখেও মা খুব খুশি।

তারপর যেন হঠাৎ মনে পড়েছে এমন ভঙ্গিতে শর্মি বলল, বাবা, তোমার মনে আছে, আদিনাথের মন্দিরের ভেতর আমি আর মা ঢুকে পড়েছি, তুমি আমাদের ছবি তুলেছিলে, পূজারী ভদ্রলোক খুব রেগে গিয়েছিলেন।

ঘটনাটা মনে পড়ল না জাহিদ সাহেবের। চিন্তিত গলায় বললেন, তাই নাকি! এটা তো আমার মনে নেই। আচ্ছা শোন, তোর মা যে বৃষ্টি খুব পছন্দ করতেন সে কথা তোর মনে আছে?

কি বলো, মনে থাকবে না! সিলেট থেকে তামাবিল যাচ্ছি আমরা, ইস, সারাটা রাস্তায় যে কি বৃষ্টি!

সত্যি, অমন বৃষ্টি সারাজীবনেই কম দেখেছি আমি। আমরা যাচ্ছিলাম মাইক্রোবাসে। তুই, আমি তোর মা আর শাহিন। মানে আমাদের সিলেটের দোকানের ম্যানেজার। সিলেট থেকে জাফলং তামাবিলের রাস্তাটা অসাধারণ। একেবারে ইউরোপ-আমেরিকার রাস্তার মতো। একদম সোজা, বেশ চওড়া, বেশ স্মুথ। সেই রাস্তার দু'পাশে বিশাল বিল। বর্ষার পানিতে একবারে টইটম্বুর।

কিন্তু কিছুই দেখা যাচ্ছিল না বৃষ্টিতে। মনে হচ্ছিল ঘনকুয়াশায় ডুবে আছে চারদিক। দশ-বিশ হাত দূরের জিনিসও দেখা যাচ্ছিল না।

তবু যে কি এনজয় আমরা করেছি। বৃষ্টি দেখে তোর মা একেবারে মুগ্ধ। শিশুর মতো ছটফট ছটফট করছিল।

শর্মি চায়ের কাপ নামিয়ে রাখল। আমার মনে আছে, সব মনে আছে।

জাহিদ সাহেবও তার চা শেষ করেছেন। কাপটা টেবিলের ওপর রেখে বললেন, কিন্তু তামাবিল পৌঁছাবার পর একদম বৃষ্টি নেই। ওখানে নেমে আমরা ঘুরে বেড়ালাম, ছবি তুললাম, চা খেলাম।

আমি যে একটা কাণ্ড করেছিলাম তোমার মনে আছে, বাবা?

মেয়ের মুখের দিকে তাকালেন জাহিদ সাহেব। কি বল তো?

বাংলাদেশ-ইণ্ডিয়ার বর্ডারে গিয়ে দাঁড়ালাম। ওখানে বিডিআর চেকপোস্ট। একটা ঝুলন্ত বাঁশের এপারে বাংলাদেশ ওপারে ইন্ডিয়া। বাঁশটির সামনে দাঁড়িয়ে ওপাশে একটি পা দিয়ে আমি বললাম, দেখ বাবা, আমি এখন ইণ্ডিয়াতে।

জাহিদ সাহেব হাসলেন। এখন মনে পড়ছে।

আর ফেরার সময়কার কথা তোমার মনে আছে? ওপাশের ভারতীয় আকাশ ছোঁয়া পাহাড় থেকে যে ছবির মতো ঝরছিল ঝরনা।

হ্যাঁ, ঝরনা দেখেও তোর মা খুব খুশি হয়েছিলেন।

তারপর দু'জনেই কেমন চুপচাপ হয়ে গেল। কিছুটা সময় কাটল নিঃশব্দে।

এক সময় জাহিদ সাহেব বললেন, তোর মার মনটা খুব নরম ছিল। মানুষের জন্য খুব মায়া ছিল তার।

শর্মি বলল, ঠিকই বলেছে। তোমার মনে আছে বাবা, আমাদের বাড়িতে একটা বুয়া ছিল আছিয়া নামে। বুয়ার নয়-দশ বছরের ছোট ভাইটি রিউমেটিক ফিবারে মরো মরো। পা দু'টো অচল হয়ে গেছে। প্রায় পঙ্গু। গ্রামে গিয়ে বুয়া তার ভাইটিকে নিয়ে এল। তোমার ভয়ে উপরে আনল না, সিঁড়ির তলায় শুইয়ে রেখে উপরে এসে মার পা জড়িয়ে ধরে কেঁধে ফেলল। আফা, আমার ভাইটারে আপনে বাচান।

সব মনে আছে। ছেলেটির নাম ছিল ইলতুতুমিস। আমাকে কিছু বুঝতে না দিয়ে তোর মা তাকে শিশু হাসপাতালে ভর্তি করাল। ছ'সাত মাস চিকিৎসা করাল। কিন্তু পুরোপুরি সেরে সে ওঠেনি। একটা পা টেনে টেনে হাঁটতো।

কিন্তু বেঁচে তো গেল। তারপর কিছুদিন আমাদের বাড়ীতে কাজও করেছিল। জাহিদ সাহেব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। ভাল মানুষরা বেশিদিন বেঁচে থাকে না মা, বুঝলি। তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশ বছর বয়সে মারা গেলেন তোর মা। স্ট্রোক করল, কোমায় চলে গেল। আঠারো দিন থাকল জীবনমৃত্যুর মাঝখানে। তারপর চিরবিদায়। গতকাল সাত বছর পুরো হলো।

মৃত্যুর স্মৃতি পরিবেশ ভারী করে তোলে। এখনও তাই হলো। বাপ মেয়ে দুজনেই কেমন উদাস হয়ে গেল। বোধহয় এই অবস্থা কাটাবার জন্যই মেয়ের মুখের দিকে তাকালেন জাহিদ সাহেব। তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে কিছু একটা যেন খেয়াল করার চেষ্টা করলেন।

বাবাকে এভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে অবাক হলো শর্মি। কী দেখছ?

তোকে।

সঙ্গে সঙ্গে শর্মি তার স্বভাবসুলভ উচ্ছল ভঙ্গিতে বলল, আমাকে কেমন লাগছে বাবা?

ভাল, খুব ভাল। কিন্তু তোর সাজগোছের মধ্যে একটা খুঁত আছে।

কী?

তুই আজ টিপ পরিসনি। টিপ পরলে সাজটা বোধহয় কমপ্লিট হবে।

বুঝলাম। কিন্তু কমপ্লিট করে লাভ কী? সুন্দর সাজগোছ করে ঘরে বসে থাকার কোনও মানে আছে?

চল তাহলে বাইরে কোথাও যাই।

কোথায়? তোকে বাইরে কোথাও খাইয়ে নিয়ে আসি।

শুনে আনন্দে একেবারে লাফিয়ে উঠল শর্মি। সত্যি? তাহলে শেরাটনে নিয়ে যাও বাবা। শেরাটনের পুলসাইটটা

আমার খুব ভালো লাগে। ওখানে বসে দুজনে আমরা গল্প করব আর খাব।

আচ্ছা। তোকে আজ দুটো ঘটনার কথা বলব। একটা হচ্ছে তোর মায়ের মৃত্যুর সময়কার। তোর মা যখন

কোমায়, হাসপাতালের বেডে না জীবিত না মৃত অবস্থায়, সে সময় একদিন ভোররাতে অদ্ভুত একটা দৃশ্য দেখেছিলাম আমি। আমাদের এই উত্তরাতেই ঘটেছিল ঘটনাটা।

কী ঘটনা?

জাহিদ সাহেব মাত্র কথা বলবেন, তাঁর বেডসাইডে রাখা টেলিফোন বেজে উঠল। জাহিদ সাহেব প্রায় সঙ্গে সঙ্গে

উঠলেন। আমরা তাহলে সাড়ে বারোটার দিকে বেরুব।

শর্মিও উঠল। আচ্ছা।

তারপর বাবার রুমে না ঢুকে বারান্দা দিয়ে নিজের রুমে চলে এল। এ সময় আবার মনে পড়ল সেই মানুষটির কথা। কেন শর্মিকে সে ফলো করছে? কী চায়? প্রেম! প্রেম কি এইভাবে পাওয়া যায়! এইভাবে হয়! গল্প উপন্যাস সিনেমা নাটকে হয়তো হয়। বাস্তবে কি হয়!

ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় অনেকগুলো টিপ লাগানো। যখন যেটা পড়ে এখান থেকে নিয়েই পরে শর্মি। খুলে এখানেই লাগিয়ে রাখে। আঠা শেষ হয়ে গেলে আপনা আপনিই ঝরে যায় কোনও কোনওটা, তখন নতুন টিপ বের করতে হয়।

কিন্তু এখন যেগুলো আছে সবগুলোই প্রায় নতুন।

মাঝারি সাইজের একটা টিপ নিয়ে পরল শর্মি। সঙ্গে সঙ্গে তার সৌন্দর্য যেন বহুগুণ বেড়ে গেল। সত্যি এখন যেন সাজটা তার কমপ্লিট হলো। আকাশি রংয়ের শাড়ি, লাল টিপ, গোলাপের মতো সৌন্দর্য সব মিলিয়ে বসন্ত রাতের এক টুকরো চাঁদের আলো এসে যেন ঢুকে গেছে শর্মির রুমে। আয়নায় নিজের দিকে তাকিয়ে শর্মি মনে মনে সেই মানুষটির উদ্দেশে বলল, তোমার দুর্ভাগ্য, আজ আমাকে তুমি দেখতে পেলে না। দেখলে মাথা তো খারাপ হতোই, শুধু ইউনিভার্সিটিতে না আমাকে ফলো করতে করতে তুমি নিশ্চয় এই বাড়ী পর্যন্ত চলে আসতে। আমাদের বাড়ীর সঙ্গের রাস্তার ওপাশে যে বকুলগাছ ওই বকুলগাছের তলায় দাঁড়িয়ে আমার রুমের জানালার দিকে তাকিয়ে থাকতে, কখন একপলক দেখতে পাবে আমাকে।

কী রে, কী বলছিস মনে মনে?

চমকে পেছন ফিরে তাকাল শর্মি। নীলু ফুফু কখন এসে ঢুকেছেন তার রুমে। হাসিমুখে ফুফুকে সে বলল, মনে

মনে বলা কথা কি তুমি শুনতে পাও?

নীলু হাসলেন। হ্যাঁ তোরটা পাই।

তাহলে বলো তো কী বলছিলাম?

বলছিলি তোর সঙ্গে যার বিয়ে হবে সে দেখতে কেমন? কী করে? কোথায় থাকে!

বিয়ের কথা শুনে লজ্জা পেল শর্মি। ধুৎ। আমার মনের কথা তুমি কিছুই শুনতে পাওনি। আমি বলছিলাম

একেবারেই উল্টো কথা।

কী বল তো!

এগিয়ে এসে দুহাতে ফুফুর গলা জড়িয়ে ধরল শর্মি। আমি বলছিলাম, এখন আমি ফুফুর কাছে যাব। গিয়ে বলব,

ফুফু, আমি আজ ছোট্ট খুকি। তুমি আমাকে একটু কোলে নাও।

নীলু হাসলেন। ধুৎ পাগল মেয়ে।

নীলুর কথা পাত্তা দিল না শর্মি। শিশুর মতো আবদেরে গলায় বলল ও ফুফু, নাও না আমাকে একটু কোলে।

কতদিন তোমার কোলে চড়ি না।

তারপর আচমকা খিলখিল করে হাসতে লাগল।

সেও এক বসন্তকালের কথা।

সৈয়দ মামাদের বাড়ীর পশ্চিম দিককার মাঠে আলমগীর মামার সঙ্গে গোল্লাছুট খেলতে গেছি। কত বয়স হবে আমার তখন! দশ! আলমগীর মামাও আমার বয়সী। মার মেজো চাচার দ্বিতীয় পক্ষের ছোট ছেলে। খুবই দুরন্ত স্বভাবের, ডানপিটে ধরনের। আর আমি ছিলাম ন্যালাভোলা, গোলগাল, নিরীহ। কথা বলার স্বভাব তখন থেকেই কম। মুখে যত না বলি, মনে বলি তারচে' হাজারগুণ।

তো সেই বিকেলে খেলতে খেলতে অকারণেই আমাকে একটা ধাক্কা দিয়েছিল আলমগীর মামা। ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল। আমার কোনও দোষ ছিল না তবু কেন ধাক্কাটা দিল?

তেমন ব্যথা আমি পাইনি কিন্তু রাগে ক্রোধে বুক ফেটে যাচ্ছিল। দুঃখও হচ্ছিল। কেন আমার সঙ্গে এমন করল আলমগীর মামা!

না, আমি কাঁদিনি। মন খারাপ করে আলমগীর মামার মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। আর খেলিওনি সেদিন। হয়তো সেই বিকেলেই ধাক্কা দেওয়ার কথা ভুলে গিয়েছিল আলমগীর মামা। কিন্তু আমি ভুলিনি। দিনের পর দিন রাতের পর রাত আমার মনে পড়েছে সেই ধাক্কার কথা। বুকের ভেতর ফুঁসে উঠেছে রাগ ক্রোধ।

কিন্তু ওই মুহূর্তে প্রতিবাদ আমি করিনি কেন? কেন আলমগীর মামাকেও একটা ধাক্কা দিইনি! ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিইনি কেন? আমার গায়ে কি জোর কম ছিল! আলমগীর মামার সঙ্গে কি আমি পারতাম না!

রাগ ক্রোধের সঙ্গে এ কথাও আমার বহুবার মনে হয়েছে। তবে সেই ধাক্কার প্রতিশোধ আমি নিয়েছিলাম, আলমগীর মামাকে ধাক্কা দিয়ে কিংবা মারপিট করে না, অন্যভাবে। বেশ অনেকদিন পর, শীতের শুরুর দিকে।

বিকেলের মুখে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি আমরা দুজন। আমার পরনে ইংলিশ প্যান্ট আর স্যান্ডোগেঞ্জি। আলমগীর মামা পরেছে লুঙ্গি, খালি গা কিন্তু কাঁধের ওপর ফেলা একেবারেই নতুন একটা হাওয়াই শার্ট। ওই বয়সেই আলমগীর মামার ভাবভঙ্গি, চালচলন বড়দের মতো। মেয়েদের নিয়ে দুএকটি অসভ্য কথাও সে বলে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে নতুন পুকুরের সামনে এসেছি আমরা, ভেতরবাড়ি থেকে মেজোনানার গম্ভীর গলার ডাক ভেসে এল। আলইম্মা, ঐ আলইম্মা।

নানাকে বাঘের মতো ভয় পেত আলমগীর মামা। ডাক শুনে মুখটা শুকিয়ে গেল তার। এমন দিশেহারা হলো, দিকপাস না তাকিয়ে পাগলের মতো দৌড় দিল বাড়ির দিকে। দৌড়ের তালে শার্টটা যে পড়ে গেল কাঁধ থেকে, টেরই পেল না। মুহূর্তে ভেতর বাড়িতে উধাও হয়ে গেল।

আলমগীর মামার শার্টের দিকে তাকিয়ে আমার বুকের ভেতর ফুঁসে উঠল এক বিষাক্ত সাপ। রাগ-ক্রোধ এবং অপমানের জ্বালায় ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল কান-মুখ! কেন অমন করে আমাকে সে ধাক্কা দিয়েছিল? কী অন্যায় করেছিলাম আমি?

সেই নতুন হাওয়াই শার্টে আমি তারপর বেশ কয়েকটি বড় সাইজের মাটির ডেলা গিঁট দিয়ে বেঁধেছিলাম। পোটলার মতো করে ছুড়ে ফেলেছিলাম নতুন পুকুরে। চোখের সামনে মুহূর্তে ডুবে গিয়েছিল আলমগীর মামার শার্ট। আশ্চর্য ব্যাপার, সেই মুহূর্তেই মনটা কেমন শান্ত হয়ে গেল আমার। বুকের ভেতর জমে থাকা রাগ-ক্রোধ কোথায় মিলিয়ে গেল। ধাক্কা খেয়ে পড়ে যাওয়ার অপমান মূহূর্তেই যেন ভুলে গেলাম আমি। আমার

শুধু মনে হলো একটু অন্যরকমভাবে প্রতিশোধটা আমি নিতে পেরেছি। আলমগীর মামার প্রিয় নতুন শার্ট এমনভাবে পানিতে ডুবিয়ে দিয়েছি কেউ কোনওদিন সেই শার্টের হদিস পাবে না। আমি ছাড়া কেউ কোনদিনও জানবে না শার্টের পরিণতি।

খুবই প্রফুল্ল মন নিয়ে আমি তারপর মাঠের দিকে চলে গিয়েছিলাম। সেদিন আলমগীর মামার সঙ্গে আমার আর দেখাই হয়নি। নানা বোধ হয় কোথাও পাঠিয়েছিল তাকে। পরদিন খুবই চিন্তিত গলায় সে আমাকে বলল, আমার শার্টটা দেখছিলি মামু? দৌড়ের তালে কই যে পড়ল আর বিচড়াইয়া পাইলাম না। এই শার্টের লেইগা বাবায় যে আমারে কী পিডানডা পিডাইবো!

শুনে আমি দুঃখ মুখ করে বললাম, না তো! তর শার্ট তো আমি দেহি নাই। আ হা রে, নতুন শার্টটা তুই হারালি কেমতে? অহন তো মাইর তর খাইতেই হইব।

দুদিন পরই সেই মারটা আলমগীর মামা খেয়েছিল। গরু চড়াবার লাঠি দিয়ে আলমগীর মামাকে পেটাতে পেটাতে নানা শুধু একটা গালই দিচ্ছিলেন বউয়ার পো, এমুন বাদাইরা তুমি হইছ, নতুন শার্ট হারাইয়া ফালাও, উদিস পাওনা।

মেজোনানার প্রিয় গাল ছিল 'বউয়ার পো।' এই গালটার অর্থ খুব একটা খারাপ না। বউর ছেলে। আলমগীর মামা তো যথার্থই তাই। আর 'বাদাইরা' মানে বেহিসাবি, 'উদিস' মানে টের পাওয়া। এগুলো বিক্রমপুরের শব্দ।

কিন্তু উঠোনে ফেলে আলমগীর মামাকে যখন পিটাচ্ছিলেন নানা, বড়ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য দেখতে দেখতে, আর আলমগীর মামার 'বাবা রে, গেছি রে, গেছি রে' টাইপের ত্রাহি চিৎকার শুনে আমার মনের ভেতরটা আশ্চর্য এক আনন্দে ভরে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল আমার সেই ধাক্কার একটি নয় দুটি বড় ধরনের প্রতিশোধ আমি নিতে পেরেছি। প্রথমত, শার্টটা নষ্ট করে দিয়েছি, দ্বিতীয়ত, নানার হাতে বেদম একটা মার খাওয়াতে পেরেছি।

জীবনে সেই ছিল আমার প্রথম প্রতিশোধ নেয়া।

কিন্তু শর্মিকে কোথাও দেখছি না কেন? না ক্লাসের দিকে যেতে, না করিডরে, না সিঁড়ির কাছে। ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের এইসব জায়গাতেই তো কদিন ধরে দেখছি তাকে। তার সঙ্গে ছেলেমেয়েগুলোর কাউকে কাউকে দেখলাম। ক্লাসের দিকে যাচ্ছে কেউ, টিচার্স রুমের দিকে যাচ্ছে। দুটো মেয়েকে দেখলাম উচ্ছল ভঙ্গিতে কথা বলতে বলতে সিঁড়ি দিয়ে নামছে। এদের সঙ্গেই তো বেশিরভাগ সময় দেখি তাকে।

আজ কি সে ইউনিভার্সিটিতে আসেনি! কেন আসেনি? শরীর খারাপ! জ্বর এলো! এসময় বাংলাদেশে খুব জ্বরজ্বারি হয়। বড়ভাইর ছেলেটার দুদিন ধরে জ্বর।

কিন্তু শর্মির জ্বর এ কথা ভাবতে আমার ভাল লাগে না। কালও দেখলাম তাকে কী উচ্ছল ছটফটে প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর ফ্রেস একটি মেয়ে। বন্ধুদের সঙ্গে হৈ চৈ করছে, টিএসসিতে আড্ডা দিচ্ছে, হাসছে। সঙ্গের একটি ছেলেকে দেখলাম হাসতে হাসতে বই দিয়ে খুব মারল। সেই মেয়ের জ্বর আসবে কেন?

না না জ্বর হয়নি শর্মির। সে ভালই আছে। হয়তো ক্লাসে আসতে দেরি করছে কিংবা জরুরী কোনও ক্লাস নেই দেখে টিএসসিতে গিয়ে বসে আছে। কয়েক মাস পর যেহেতু মাস্টার্স ফাইনাল, এসময় জরুরী ক্লাস নাও থাকতে পারে।

আমি একটা সিগ্রেট ধরাই। তারপর টানতে টানতে টিএসসির দিকে হাঁটতে থাকি।

আমি বেশ ঘন ঘন সিগ্রেট খাই। চেইনস্মোকার। আমার ব্রান্ড মার্লবোরো। টোস্টেড মার্লবোরো। হার্ড সিগ্রেট। সব জায়গায় পাওয়া যায় না। বায়তুল মোকাররম, নিউমার্কেট, গুলশান এসব জায়গায় পাওয়া যায়। তিনদিন আগে এক কার্টন কিনেছিলাম। আজ সকালে শেষ দু'প্যাকেট নিয়ে বেরিয়েছি। ফেরার সময় নিউমার্কেট থেকে এক কার্টন কিনে নেব।

টিএসসিতে এসে এদিক-ওদিক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি, না শর্মি কোথাও নেই। তার বন্ধুবান্ধবও কাউকে দেখি না। তাহলে কি ভেতরে বসে চা-সিঙ্গারা খাচ্ছে ওরা!

কেন্টিনে ঢুকি। ভেতরে বেশ আগ্রহ কিন্তু মুখে খুবই নির্বিকার ধরনের একটা ভাব নিয়ে এ টেবিল ও টেবিলের দিকে তাকাই। না, শর্মি কোথাও নেই। দক্ষিণ দিককার কর্ণারের টেবিলে দেখি শর্মির সেই দুই বান্ধবী বসে চা খাচ্ছে আর কী কথায় যেন খিলখিল করে হাসছে।

আমার আবার মনে হয়, শর্মি কি আজ সত্যি সত্যি ইউনির্ভার্সিটিতে আসেনি! কেন আসবে না? সে কি জানে না আমি তার জন্য অপেক্ষা করব! এখনও কি বোঝেনি একজন মানুষ নিঃশব্দে তাকে ফলো করছে! দূর থেকে তার প্রতিটি আচরণ খেয়াল করছে! মেয়েদের শুনেছি একটা তৃতীয় নয়ন থাকে। সেই নয়ন দিয়ে অন্যে দেখে না এমন অনেক কিছুই দেখতে পায় তারা! তাহলে আমাকে কি দেখতে পায়নি শর্মি।

আচ্ছা শর্মির বান্ধবী দুজনকে কি জিজ্ঞেস করব শর্মি কোথায়? সে কি আজ ইউনিভার্সিটিতে আসেনি!

এটা ঠিক হবে?

শর্মির কথা জিজ্ঞেস করলে ওরাও আমাকে অনেক প্রশ্ন করবে। আপনি কে? কেন শর্মির কথা জানতে চাইছেন! সে আপনার কে হয়! দুএকদিন ওদের সঙ্গে থাকার পরও শর্মিকে আমি ফলো করেছি। শর্মির মতো ওরাও মেয়ে। ওদেরও তৃতীয় নয়ন থাকার কথা। ওরাও যদি খেয়াল করে থাকে আমাকে ! যদি ওই নিয়ে কোনও প্রশ্ন করে!

আমার স্বভাবের মধ্যে দুটো ব্যাপারই সমানভাবে কাজ করে, না ভেবেচিন্তে হুট করে কোনও কোনও কাজ আমি করে ফেলতে পারি। আবার দশদিক ভেবেচিন্তেও করি।

আজ অনেকদিন পর মনে হলো না ভেবেচিন্তে দুএকটা কাজ করলে কী এমন ক্ষতি হবে! দুএকটা পাগলামোও জীবনে থাকা উচিত। দেখি না মেয়ে দুটোর সঙ্গে শর্মিকে নিয়ে একটু কথা বলে।

হাতের সিগ্রেট শেষ হয়ে এসেছে, সেই সিগ্রেট থেকে আরেকটা সিগ্রেট ধরালাম। তারপর খুবই স্মার্টভঙ্গিতে মেয়ে দুটোর টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। এক্সকিউজ মি!

দুজন একসঙ্গে চোখ তুলে তাকাল।

এইসব মুহূর্তে মেয়েদের তাকানোর ভঙ্গিতে দুটো ব্যাপার কাজ করে। বেশ একটা তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের ভাব আর বিরক্তি। যেন ইচ্ছে করে তাদেরকে কেউ ডিস্টার্ব করছে।

এই দুজনের চেহারায়ও তাই দেখা গেল। ব্যাপারটা আমি তেমন পাত্তা দিলাম না। সিগ্রেটে টান দিয়ে বললাম, আপনারা তো ইংলিসে পড়েন, না?

একজন একটু লম্বা ধরনের। বেশ কাটাকাটা চেহারা। গায়ের রং শ্যামলা। চোহারায় এক ধরনের রুক্ষতাও আছে। অন্যজন ফর্সা, গোলগাল, একটু মোটা ধাঁচের।

রুক্ষ চেহারার মেয়েটি বলল, জ্বী। কেন বলুন তো?

আমি আসলে একজনকে খুঁজছি। সে আপনাদের সঙ্গে পড়ে।

অন্য মেয়েটি বলল, কী নাম?

শর্মি হক।

শর্মি নামটা শুনে দুজনেই যেন একসঙ্গে চমকাল। এ ওর মুখের দিকে তাকাল। তারপরও রুক্ষ মেয়েটি বলল, আপনি জানলেন কী করে যে আমাদের সঙ্গে পড়ে?

ওর সঙ্গে আপনাদেরকে আমি দেখেছি।

ফর্সা মেয়েটি তখন মুখের সামনে দু'তিনবার হাত নাড়ল। অর্থাৎ সিগ্রেটের ধোঁয়া সরাল। সঙ্গে সঙ্গে হাতের সিগ্রেট ফেলে পা দিয়ে পিষে দিলাম আমি। আইয়্যাম রিয়েলি সরি! আপনাদের সামনে সিগ্রেট খাওয়া ঠিক হচ্ছে না।

আমার আচরণে ফর্সা মেয়েটি যেন একটু মুগ্ধ হলো। হাসিমুখে বলল, হ্যাঁ শর্মি আমাদের সঙ্গে পড়ে। কিন্তু ও আজ ইউনিভার্সিটিতে আসেনি।

এইটুকুই জানার দরকার ছিল আমার। বললাম, তাইনাকি! কেন আসেনি জানেন? মানে আপনাদের কারও সঙ্গে কি কোনও যোগাযোগ হয়েছে? মানে শর্মির শরীর খারাপ করেনি তো! এখন চারদিকে খুব ভাইরাল ফিবার টিবার হচ্ছে।

রুক্ষ মেয়েটি বলল, না কোনও যোগাযোগ হয়নি। কিন্তু আপনি এত খোঁজ খবর নিচ্ছেন কেন? সে যে আপনার কোনও আত্মীয় নয় বুঝতে পারছি। আত্মীয় হলে খোঁজ-খবর নিতে ওদের বাড়িতে চলে যেতেন কিংবা ফোন করতেন, তা না করে ইউনিভার্সিটিতে এসেছেন খোঁজ নিতে। আমাদেরকে জিজ্ঞেস করছেন। আপনার আসলে ব্যাপারটা কী?

এইধরনের পরিস্থিতিতে আমি কখনও পড়িনি। কী বলব বুঝতে পারছি না। হুট করে পাগলামো করতে এসে তো ধরা খেয়ে গেলাম!

ফর্সা মেয়েটি স্নিগ্ধচোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তার দিকে তাকিয়ে মুহূর্তকয়েক কিছু ভাবলাম আমি। তারপর হাসিমুখে বললাম, আসলে ব্যাপার তেমন কিছুই না। আপনারা বিশ্বাস করবেন কি জানি না, তবু আমি মিথ্যে বলছি না, মিথ্যে বলার স্বভাব আমার নেই। আমার ছোটখাটো একটা এডফার্ম আছে। একটি কসমেটিকস কোম্পানীর এডের কাজ পেয়েছি। সেই কোম্পানির প্রধান শর্ত হলো তারা কোনও তথাকথিত পরিচিত ফেস কিংবা পপুলার মডেল নেবে না।

আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই ফর্সা মেয়েটি বলল, আপনি বসুন না। বসে কথা বলুন।

থ্যাংকস।

টেবিলের দুপাশে দুজন আমি বসলাম তৃতীয় পাশটায়। বাই দা বাই, আমার নাম মাহি। মাহি খান।

এতক্ষণে রুক্ষ মেয়েটি একটু যেন স্বাভাবিক হয়েছে। ফর্সা মেয়েটিকে দেখিয়ে বলল, ওর নাম ঝিনুক আর আমি তৃণা।

দুটোই খুব সুন্দর নাম। তারপর যা বলছিলাম, যেহেতু ওরা নিউ ফেস চায় সেইকারণে আমি দু'তিনদিন ধরে ইউনিভার্সিটিতে আসছি। যদি তেমন কাউকে পছন্দ হয় তাকে অফার করব।

ঝিনুক বলল, তার মানে শর্মিকে আপনার পছন্দ হয়েছে! হওয়ারই কথা। শর্মি খুব সুন্দরী।

তৃণা বলল, কিন্তু ওর নাম আপনি জানলেন কী করে?

আরে, এই মেয়েটা তো বেশ ট্যাটনা টাইপের দেখছি! উকিলের মতো প্রশ্ন করে!

তবু হাসিমুখে উত্তরটা আমি দিলাম। এটা কি খুব কঠিন কাজ বলুন! আপনাদের এক বন্ধুর কাছ থেকেই ট্যাক্টফুলি জেনে নিয়েছি।

কোন বন্ধু?

তার নাম আমি জানি না। সরি। তবে সে ছেলে। যা হোক দু'তিন দিন ধরে ইউনিভার্সিটিতে ঘুরে ঘুরে অনেককেই দেখলাম কিন্তু শর্মিকেই আমার পছন্দ হলো। ভাবলাম আজ তার সঙ্গে কথা বলব আর দেখুন আজই সে এল না।

ঝিনুক বলল, কিন্তু মডেলিং ও করবে বলে আমার মনে হয় না।

কেন বলুন তো?

ও এসব পছন্দ করে না।

কিন্তু আজকাল অনেকেই মডেলিং করছে! আমি প্রথমে ভেবেছিলাম 'নতুন মুখ চাই' বা এই জাতীয় একটা এড দেব পেপারে। শুনে আমার একজন এক্সিকিউটিভ বলল, এই কাজ করবেন না স্যার। তাহলে শয়ে শয়ে মেয়ে এসে হাজির হবে। হাজার হাজার চিঠি এবং ছবি আসবে। আরেক ঝামেলা।

মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণ চোখে তৃণা আমাকে দেখছিল। বুঝতে পারি আমার সবকথা সে বিশ্বাস করছে না। তার মধ্যে একটা সন্দেহ কাজ করছে।

করুক। আমার কি! আমার যা জানার ছিল তাতো আমি জেনেই ফেলেছি। শর্মি আজ ইউনিভার্সিটিতে আসেনি।

কিন্তু কিছু একটা বলে তো তৃণা এবং ঝিনুকের কাছ থেকে বিদায় নিতে হয়। কী বলব?

ঝিনুকের দিকে তাকিয়ে বললাম, আপনারা আমাকে একটু হেল্প করবেন। শর্মিদের ফোন নম্বর কিংবা বাড়ির এডড্রেসটা দেবেন। আমি তাহলে সরাসরি যোগাযোগ করি।

ঝিনুক কথা বলবার আগেই তৃণা বলল, শর্মিকে না বলে সেটা আমাদের দেয়া ঠিক হবে না। তারচে' আপনি বরং আপনার একটা কার্ড দিন আমরা শর্মিকে দিয়ে দেব এবং ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলব। সে যদি ইন্টারেস্টেড হয় তাহলে আপনাকে ফোন করবে। আর যদি ফোন না করে, ধরে নিতে হবে সে ইন্টারেস্টেড না।

তৃণার কথাবার্তা শুনে ভেতরে ভেতরে খুবই বিরক্ত আমি। বিক্রমপুরের ভাষায় মনে মনে মোটামুটি ভদ্রগোছের দু'তিনটা গাল দিয়ে দিলাম। তর চেহারা দেখলেই বুঝা যায় তুই যে বহুত ট্যাটনা। বিয়া হইলে জামাইর হালুয়া তুই টাইট কইরা ছাড়বি। যেই বেডা তরে বিয়া করব ওর জিন্দেগি ছেড়াভেড়া। তর লাহান ছেমড়ি শর্মির বান্ধবী হইলো কেমতে!

কিন্তু মুখটা খুব হাসি হাসি আমার। বিনয়ের অবতার হয়ে বললাম, সরি। আমার সঙ্গে আজ কার্ড নেই। মানিব্যাগে কার্ড রাখি। দু'তিন দিন আগে শেষ হয়েছে, নতুন করে রাখতে মনে নেই। একটা কাজ করুন, আমার সেল নম্বরটা, সরি মোবাইল নাম্বারটা রাখুন। ওটা শর্মিকে দিয়ে দেবেন।

তৃণা নয়, আমার নাম্বার লিখে রাখল ঝিনুক।

টিএসসি থেকে বেরিয়ে প্রথমে আমি একটা হাঁফ ছাড়লাম তারপর সিগ্রেট ধরালাম। ইস, বানিয়ে বানিয়ে এত কথা বলা যায়! তবে বলেছি খুব স্মার্টলি। হঠাৎ করেই এড কোম্পানির মডেলিং এসব মাথায় আসার ফলে বেশ জমে গিয়েছিল গল্পটা। একটুও নার্ভাস না হয়ে ভালোই চালিয়ে গেলাম। ঝিনুক কিংবা তৃণার বোঝার কোনও উপায় ছিল না যে পুরো ব্যাপারটাই ফলস, বানোয়াট।

কিন্তু শর্মি আজ ইউনিভার্সিটিতে আসেনি কেন? কী হয়েছে তার? সত্যি সত্যি জ্বর হয়নি তো!

শর্মির দুটো ছবি আছে আমার কাছে। বি টু সাইজের। একটা আকাশি রংয়ের সালোয়ার কামিজ পরা আরেকটা ফিরোজা রংয়ের শাড়ি পরা। সালোয়ার-কামিজ পরা ছবিটা অসাধারণ। সেটা আমি আমার পাসপোর্টের ভেতর, স্যুটকেসে রেখে দিয়েছি। অন্য ছবিটা গলার কাছ থেকে সুন্দর করে কেটে শুধু ফেসটা আমেরিকান ভিসার জন্য যে সাইজের ছবি লাগে সেই সাইজ করে নিয়েছি। এই সাইজের ছবি মানিব্যাগের গোপন পকেটে রাখতে সুবিধা।

মানিব্যাগ থেকে ছবিটা আমি বের করলাম। অসাধারণ মিষ্টি চেহারার শর্মি গজদাঁত বের করে হাসছে। আর তাকানোটা এমন, যেন আমার দিকেই তাকিয়ে আছে।

সেই ছবির দিকে তাকিয়ে মনে মনে বললাম, শর্মি, তোমার কী হয়েছে? ইউনিভার্সিটিতে আসনি কেন? তুমি কি জান না আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব!

তখন দ্বিতীয় পাগলামোটা খেলে গেল আমার মনে। আচ্ছা শর্মিকে ফোন করলে কেমন হয়! ঝিনুক-তৃণার সঙ্গে চালাকি করে শর্মির ফোন নাম্বার চেয়েছিলাম, আসলে ফোন নাম্বার-এডড্রেস সবই তো আছে আমার কাছে।

কিন্তু ফোন যদি অন্য কেউ ধরে?

সেটাই স্বাভাবিক। শর্মিই যে ফোন ধরবে এমন তো কোন কথা নেই।

যে ইচ্ছে ধরুক, সরাসরি শর্মিকে চাইব। পরিচয় জানতে চাইলে নামটা ঠিক বলে এডফার্মের গল্পটা চালিয়ে দেব, ঝিনুক-তৃণার সঙ্গে যেমন চালিয়েছি। তারপর শর্মি ফোন ধরলে...

শর্মিকে কী বলব সেকথা আমার আর মনে আসে না। সিগ্রেট টানতে টানতে শাহবাগের দিকে হাঁটতে থাকি।

শাহবাগের কোণে পিজি হাসপাতালের মুখে দু'তিনটি ফোন ফ্যাক্সের দোকান। একটা দোকানে ঢুকে শর্মিদের বাড়িতে ফোন করি। শর্মির ছবি, ফোন নাম্বার, এডড্রেস ইত্যাদি পাওয়ার পর আজই তাকে প্রথম ফোন করা। আমার হিসেবটা ছিল এই রকম যে, ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে প্রথমে তাকে আমি দূর থেকে দেখব। ছবির সঙ্গে কতটা মিল তার, কতটা অমিল। তার আচার-আচরণ, চলাফেরা কেমন। কোন ধরনের ছেলেমেয়ের সঙ্গে সে মেশে। দেখে স্যাটিসফাইড হলে ফোন করব, কথা বলব। তারপর সরাসরি একদিন সামনে গিয়ে দাঁড়াব।

প্রথম পর্বটা আমি শেষ করেছি। তারপর আজই ফোন করার কোনও প্ল্যান আমার ছিল না। ইউনিভার্সিটিতে এসে শর্মিকে না পেয়ে মনের ভেতর চাড়া দিয়ে উঠল পাগলামো। ঝিনুক-তৃণার সঙ্গে কথা বললাম। এখন ফোন করছি।

ফোন ধরল একটা ছেলে। গলার আওয়াজে বোঝা গেল কিশোর বয়সী হবে এবং ভাষায় বোঝা গেল বাড়ির কাজের ছেলে।

হ্যালু, কারে চান?

এটা কি জাহিদুল হক সাহেবের বাড়ি।

জ্বে।

শর্মি আছে?

জ্বে না। নাই।

কোথায় আছে?

কইতে পারি না। আপনে কে?

প্রশ্নটার উত্তর আমি এড়িয়ে যাই। কখন বেরিয়েছে বলতে পার? মানে ইউনিভার্সিটিতে গিয়েছে নাকি অন্য কোথাও?

ছেলেটা এবার বেশ গম্ভীর হলো। কিন্তু আপনে কে সেইটা বলতাছেন না ক্যান? সেইটা না বললে আপনার কথার আমি জবাব দেব না।

বুঝে গেলাম ছোকড়াটা তৃণা টাইপের। ট্যাটনা। আমি কি এখন আমার নাম বলে, মিথ্যে বানোয়াট পরিচয় দিয়ে ওর কাছ থেকে কথা বের করব! সেটা কী এমন কঠিন কাজ!

গম্ভীর গলায় বললাম, এই ছেলে, তুমি যে এভাবে আমার সঙ্গে কথা বলছ, তুমি জানো আমি কে? আমি শর্মির মামাতো ভাই। আমার নাম...

না বলার আগেই বেশ নার্ভাস গলায় ছেলেটা বলল, তয় আপনে ফুবুআম্মার সঙ্গে কথা বলেন।

বলেই ফোন নামিয়ে রেখে ফুবুআম্মা, ফুবুআম্মা বলে চিৎকার করে কাকে ডাকল। সঙ্গে সঙ্গে লাইনটা আমি কেটে দিলাম। এখন নিশ্চয় শর্মির নীলু ফুপু এসে ফোন ধরবেন। তঁর সঙ্গে কথা বলতে আমার ভাল লাগবে

না। ততোক্ষণে বেশ দুপুর। খিদে পেয়েছে আমার। একটা ফাস্টফুডের দোকানে ঢুকে বিফবার্গার আর কোক খেলাম। খেতে খেতেই মাথায় তৃতীয় পাগলামোটা এল আমার। আমি এখন শর্মিদের বাড়িতে যাব।

পিজির গেটের সামনে রিকশা, সিএনজি, ট্যাক্সিক্যাব সবই আছে। আমি একটা কালো রংয়ের ট্যাক্সিক্যাবে চড়ি।

উত্তরা যান।

উত্তরা নামটি বলার সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভেতর আশ্চর্য এক অনুভূতি হয় আমার। সেই ভয়ঙ্কর ঘটনার কথা মনে পড়ে।

আমি তোর বিয়ের কথা ভাবছি।

গভীর মনোযোগ দিয়ে মেনু দেখছিল শর্মি। বাবার কথা শুনে চমকে চোখ তুলে তাকাল। যেন কথাটা সে শুনতে পায়নি এমন গলায় বলল, কী বললে?

জাহিদ সাহেব হাসলেন। তুই বড় হয়ে গেছিস!

এতে হাসির কী হলো?

না হাসছি অন্যকথা ভেবে।

কী কথা?

আগের দিনের লোকেরা নামের শেষে শিক্ষাগত যোগ্যতাটা লাগিয়ে দিত। অমুক রহমান বিএ। অনার্স থাকলে ব্রাকেটে আবার অনার্সটা লাগাত। কয়েক মাস পর তুই হচ্ছিস শর্মি হক, এমএ।

এবার শর্মিও হাসল। ব্রাকেটে অনার্সটা লাগাও। অনার্সে এত ভাল রেজাল্ট আমার আর সেটা তুমি লাগাবে না!

আচ্ছা লাগালাম।

এবার ঝেরে কাশো। মানে পরিষ্কার করে বলো কী বলছিলে!

আগে খাবারের অর্ডার দে।

কাউন্টারের দিকে স্লিপপ্যাড হাতে দাঁড়িয়ে আছে একজন ওয়েটার। আড়চোখে শর্মির দিকে তাকাচ্ছে। আচরণে বোঝা যায় শর্মির অর্ডার নেয়ার জন্য ভেতরে ভেতরে বেশ উদগ্রীব সে।

হাত ইশারায় লোকটিকে ডাকল শর্মি। মুহূর্তে ছুটে এল সে। খাবারের অর্ডার দিল শর্মি। কিন্তু আইটেম যেন কম মনে হলো জাহিদ সাহেবের। বললেন, এত কম অর্ডার দিলি কেন?

কম কোথায়? চারটা আইটেম।

সবই মনে হলো ফিস।

হ্যাঁ। প্রণ পমফ্রেটস আর মেন্ডারিন ফিস। তুমি বলেছ আমার যা পছন্দ তাই খাবে। ভেজিটেবল রাইসের সঙ্গে এই তিনটে ফিসই খুব ভাল লাগবে।

তা বুঝলাম, দু'একা মাংসের আইটেম দিলেও পারতি।

শর্মি গম্ভীর গলায় বলল, বাবা, তুমিই আমাকে শিখিয়েছ মাছ, মাংস এক সঙ্গে খেতে হয় না। আমাদের বাড়িতে কোনদিনও মাছ আর মাংস একদিনে রান্না হয় না। যেদিন মাছ হবে, শুধু মাছ। আর যেদিন মাংস শুধুই মাংস। সঙ্গে কমন আইটেম সবজি আর ডাল।

আজ একটু অনিয়ম হলেও অসুবিধা নেই।

তা না হয় বুঝলাম কিন্তু দুজন মানুষ কত খাব! আর অপচয় আমি পছন্দ করি না!

ঠিক আছে। সফট ড্রিংকস দিতে বল। খাবারের আগে গলাটা একটু ভেজাই।

নিজের জন্য কোক আর বাবার জন্য স্প্রাইট দিতে বলল শর্মি। তারপর বাবার দিকে তাকাল। এবার বলো। মেয়ের মুখের দুকে তাকালেন জাহিদ সাহেব। আবার বললেন, আমি তোর বিয়ের কথা ভাবছি। বাবার মুখে সরাসরি নিজের বিয়ের কথা, শর্মি যেন একটু লজ্জা পেল। যদিও বাবার সঙ্গে তার সম্পর্ক বন্ধুর মতো, বাপ-মেয়ে সাধারণত বলে না এমন কথাও তারা দুজন কখনও বলে। তবু এই মুহূর্তে শর্মি যেন একটু লজ্জা পেল। কয়েক সেকেন্ডের জন্য মুখটা সে নিচু করে রাখল, লজ্জাটা কাটাল, তারপর মুখ তুলে বাবার দিকে তাকাল। অতি সহজ সরল গলায়, যেন বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছে এমন ভঙ্গিতে বলল, মেয়ে বড় হলে সব বাবা মাই তার বিয়ের কথা ভাবে। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। তুমি কি শুধুই ভেবেছ না এগিয়েছ?

কিছুটা এগিয়েছি।

মানে ঘটক লাগিয়েছ?

ঠিক ঘটক না। প্রফেশনাল ঘটক আমার পছন্দ না। আমার এক পরিচিত ভদ্রলোক, মানে একজন প্রকাশক, তুই তাকে দেখেছিস কিন্তু মনে আছে কি না আমি জানি না। খান সাহেব, সে একটা সম্বন্ধ এনেছে। সঙ্গে সঙ্গে সেই মানুষটার কথা মনে পড়ল শর্মির। কেন, বুঝতে পারল না। একটু আনমনা হল। শর্মির আনমনা ভাবটা খেয়াল করলেন জাহিদ সাহেব। বললেন, তোর মা বেঁচে থাকলে আমার অনেক সুবিধা হতো।

শর্মি অবাক হল। কেমন?

যেসব কথা আমার বলতে হচ্ছে এসব তোর মা বলতেন।

তুমিও বলতে পার। কোনও অসুবিধা নেই।

অবশ্য নীলুকে দিয়েও বলাতে পারতাম।

কোনও দরকার নেই বাবা। আমি তেমন পুতুপুতু স্বভাবের মেয়ে নই, তুমিও পুরনো দিনের বাবা নও। সবকিছু আমাকে সহজ করে বলো। আমারও যদি তোমাকে কিছু বলার থাকে বলব।

গুড, ভেরিগুড। ছেলেটি সম্পর্কে আমি পরে বলি, তার আগে তোর কাছ থেকে দুএকটি কথা আমার জানা দরকার।

শর্মি হাসল। আমি জানি তুমি কী জানতে চাইবে। প্রশ্ন করবার দরকার নেই, উত্তরটা আমিই দিয়ে দিচ্ছি। আমার নিজের কাউকে পছন্দ নেই, কোনও ভাল লাগা, এফেয়ার টেফেয়ার কিছু নেই। তুমি নিজেও বেশ ভাল করেই জানো। তোমার পছন্দেই আমি বিয়ে করব। তোমার কথার বাইরে আমি যাব না।

মেয়ের কথা শুনে এতটাই মুগ্ধ হলেন জাহিদ সাহেব, হাত বাড়িয়ে মেয়ের গালটা একটু ছুঁয়ে দিলেন। শিশুকে আদর করার গলায় বললেন, ওরে আমার মেয়েটা! আমি খুব খুশি হয়েছি মা। খুব খুশি হয়েছি।

এ সময় কোক স্প্রাইট এল, দুজনের প্রায় একসঙ্গে গ্লাসে চুমুক দিল।

জাহিদ সাহেব বললেন, এবার তাহলে ছেলেটার কথা বলি।

শর্মি কথা বলল না।

জাহিদ সাহেব বললেন, তার আগে তোর পারমিশন নিয়ে একটা সিগারেট খেতে পারি?

শর্মি চোখ পাকিয়ে বাবার দিকে তাকাল। না।

আমি তো রেগুলার খাচ্ছি না। একদিন খেলে কী হবে?

না। বদ অভ্যোস একটু একটু করেই হয়। আজ একটা খেলে কাল দুটো খেতে ইচ্ছা করবে। এভাবে অভ্যাস হয়ে যাবে।

আরে না। তুই পছন্দ করিস না এমন কাজ আমি কখনই করব না।

মানুষ অভ্যাসের দাস। অভ্যাস বদলানো খুব কঠিন। যা ছেড়েছ তা আর ধরা ঠিক হবে না। আবার যদি ধরো দেখা গেল আগের চেয়ে বেশি খেতে শুরু করেছ। আমার ভয়ে বাইরে গিয়ে খাচ্ছ। বাথরুমে গিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে খাচ্ছ। মোবারককে দিয়ে একটা দুটো করে আনাচ্ছ।

না তেমন আর হবে না।

হতে পারে।

আচ্ছা ঠিক আছে। খেলাম না।

সবচে' বড় কথা সিগ্রেটের গন্ধ আমার ভাল লাগে না।

অথচ ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিগুলোতে মেয়েরা আজকাল বেশি সিগ্রেট খাচ্ছে।

খাক গিয়ে।

দুজনেই একটু থামল।

শর্মির তখন ভেতরে ভেতরে বেশ একটা অস্থিরতা চলছে। কথাটা পরিষ্কার বলছে না কেন বাবা! কেমন সম্বন্ধ এনেছেন খান সাহেব। ছেলেটা করে কী? পড়াশুনা কতদূর, দেখতে কেমন, ফ্যামিলি কেমন এসব জানার জন্য শর্মি যে উদগ্রীব হয়েছে বাবা কি তা বুঝতে পারছে না! এরকম একটি কথা বেশিক্ষণ না বলে সে থাকছেই বা কেমন করে!

বাবা অবশ্য শর্মির মতো অস্থির ধরনের মানুষ নয়। ধীর স্থির শান্ত স্বভারের। যে কোনও কাজ দশবার ভেবে চিন্তে করে।

তা করুক গে। কিন্তু এখন শর্মিকে এমন সাসপেনসের মধ্যে রেখেছে কেন ? বলছে না কেন কথাগুলো!

মেয়ের মনের অবস্থাটা যেন এ সময় বুঝতে পারলেন জাহিদ সাহেব। হাসিমুখে বললেন, তোর খুব অস্থির লাগছে, না ?

শর্মি হাসল। তোমার কি মনে হয় ? লাগবার কথা না ?

হ্যাঁ। তোর জায়গায় আমি হলে আমারও লাগতো।

তাহলে বলে ফেল।

ছেলেটির নাম গালিব। গালিব আহসান চৌধুরী। গুলশানে নিজেদের বাড়ি। ব্যাঙালোর থেকে এমবিএ করেছে। বাবার শিপিং বিজনেস। অয়েলট্যাঙ্কার কারগো, বরিশাল পটুয়াখালী যাওয়ার দোতলা বিশাল বিশাল লঞ্চ আছে চার পাঁচটা। তিনভাই দুবোন। দুবোনেরই বিয়ে হয়ে গেছে। গালিব সবার ছোট। বাবা এখন বিজনেস দেখে না। দুই বোনজামাই, বড় দুইভাই এবং গালিব এই পাঁচজনেই দেখাশোনা করে। মতিঝিলে অফিস আছে। গালিব সেই অফিসে বসে।

হাইট কেমন ? বেটে ফেটে না তো ?

জাহিদ সাহেব হাসলেন। আমি জানতাম এই প্রশ্নটাই তুই প্রথমে করবি। খান সাহেবকে আমিও প্রথমেই বলেছিলাম ছেলের হাইট কেমন ? কালো ফর্সা কিংবা শ্যামলা গায়ের রং নিয়ে আমার কোনও কথা নেই, কথা ওই হাইট নিয়ে। বেটে মানুষ দুইচোখে দেখতে পারে না আমার মেয়ে।

খান আঙ্কেল কী বললেন ?

আমার কথা শুনে হাসলেন। আমি জানি আজকালকার ছেলেমেয়েরা বেটে পছন্দ করে না। গালিবের হাইট খুব ভালো। পাঁচ ফিট দশ।

শুনে স্বস্তির একটা শ্বাস ফেলল শর্মি। কথা বলল না।

জাহিদ সাহেব বললেন, হাইট ঠিক আছে না?

খুব যে ঠিক আছে তা নয়। আজকালকার ছেলেরা ছয় দুই তিন এমনকি চার সোয়া চারও হচ্ছে। অনেক লম্বা মেয়েও দেখা যায় এখন।

তা যায় কিন্তু তোর সঙ্গে মানানসই তো হতে হবে। অমিতাভ বচ্চন আর জয়া ভাদুড়ির মতো হলে তো হবে না।

শর্মি চোখ পাকিয়ে বাবার দিকে তাকাল। এই, আমি কি জয়া ভাদুড়ির মতো বেটে?

জাহিদ সাহেব হাসলেন। আরে না তোর হাইট ভাল। বাঙালি মেয়ে হিসেবে পাঁচ পাঁচ ভাল হাইট।

জাহিদ সাহেব স্প্রাইটে চুমুক দিলেন।

শর্মি অস্থির গলায় বলল, কিন্তু খাবার দিচ্ছে না কেন? এত দেরি করছে কেন?

এক্ষুণি দেবে মা। কোক খা।

আমার কোক শেষ।

কখন শেষ করলি?

শর্মি হাসল। কথার তালে ছিলাম। নিজেও বুঝতে পারি নি।

আর একটা দিতে বলব?

না। কোকে খুব ফ্যাট।

কিন্তু তুই খুব পছন্দ করিস।

তা করি।

তাহলে খা আর একটা। একদিন দুটো কোক খেলে কিচ্ছু হবে না। কাল না খেলেই হবে।

তোমার কি ধারণা আমি রোজ কোক খাই?

ধারণা না, তুই যে খাস তা আমি জানি।

কেমন করে জানো?

যাকে দিয়ে আনাস সেই বলেছে।

মোবারক। দাঁড়াও, বাড়ি গিয়ে আজ ওকে এমন ছেচা দেব।

এসময় খাবার নিয়ে এল ওয়েটার। জাহিদ সাহেব বললেন, আর একটা কোক দেবেন।

শর্মি তখন বাবার প্লেটে খাবার তুলে দিচ্ছে।

জাহিদ সাহেব বললেন, ছেলেটির ছবিটবি কিচ্ছু আমি দেখিনি। তবে সব শুনে আমার ভাল লেগেছে। শিক্ষিত, টাকা পয়সাঅলা ভাল ঘরের ছেলে। ভাইবোনগুলো, দুই বোনজামাই সবাই লেখাপড়া জানা। এক বোন ডাক্তার আরেক বোন ভিকারুননিসা নূনের ইংরেজির টিচার। বড়ভাই মাস্টার্স করেছে ম্যানেজমেন্টে। মেজোটা একাউন্টিংয়ে। খান সাহেব বললেন, ওরা কেউ তেমন ফর্সা না, শ্যামলা ধরনের রং সবার। তবে চেহারা

চেহারা ভাল।

শুনে শর্মি মনে মনে বলল, ফর্সা রঙয়ের পুরুষ আমার একদম পছন্দ না। কেমন আলু মুলার মতো লাগে। আমি পছন্দ করি ডার্ক, ম্যানলি পুরুষ।

সঙ্গে সঙ্গে সেই মানুষটির কথা মনে পড়ল শর্মির। সেও বেশ লম্বা, গায়ের রং কালোর দিকেই বলা যায়, আর বেশ ম্যানলি। চালচলন একেবারেই কেয়ারলেস টাইপের।

মানুষটির উদ্দেশে শর্মি মনে মনে বলল, তোমার আর কোনও চান্স নেই গো! মির্জা গালিব আমাকে বোধহয় নিয়েই যাচ্ছে।

জাহিদ সাহেব খেতে খেতে বললেন, কী ভাবছিস ?

মুখের খাবার শেষ করে শর্মি বলল, না কিছু না।

গালিবকে কেমন লাগল ?

আচমকা এরকম একটা প্রশ্ন, শর্মি চমকাল। কেমন লাগল মানে? আমি দেখেছি নাকি?

না মানে আমার কাছ থেকে শুনে!

আমার কিছু বলার নেই। তুমি যা ভাল বুঝবে তাই।

আমার কিন্তু পছন্দ।

তা আমি বুঝেছি।

আমি কি তাহলে আগাবো?

তোমার ইচ্ছা।

তবে তোকে যে তাদের পছন্দ হবে এতে আমার কোনও সন্দেহ নেই।

কী করে বুঝলে?

আমি জানি, আমার মেয়ে খুব সুন্দর।

নিজের মেয়েকে সব বাবারই সুন্দর মনে হয়।

এটা ঠিক না। কিন্তু একটা ঝামেলা হয়ে গেছে জানিস।

কী?

তোর দুটো ছবি আর বায়োডাটা চেয়েছিল ওরা। খান সাহেবকে দিয়েও ছিলাম। আজ সকালে ফোন করে খান সাহেব বললেন, খামটা নাকি সে খুঁজে পাচ্ছে না।

বলো কী? হারিয়ে ফেলেছে?

তাই তো বলল।

খুব ইরেসপনসিবল লোক দেখছি।

এভাবে বলিস না। সে ইচ্ছে করে হারায়নি।

কিন্তু ব্যাপারটা খুব ভাল হয়নি বাবা। আজকাল কত ধরনের ধান্দাবাজ লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে চারদিকে। তেমন কারও হাতে যদি আমার ছবি আর বায়োডাটা যায়, আমাকে যদি কেউ ব্লাকমেইল করে!

আরে না। কী ব্লাকমেইল করবে?

তুমি জানো না, করতে পারে।

মেয়ের প্লেটে দুটো চিংড়ি তুলে দিলেন জাহিদ সাহেব। ওসব নিয়ে তুই ভাবিস না!

আচ্ছা ঠিক আছে ভাবব না। কিন্তু তুমি আমার ছবি পেলে কোথায় ?

তোর এ্যালবাম থেকে নিয়েছি।

কই আমাকে দেখি কিছুই বলনি।

বলিনি ইচ্ছে করেই। ভেবেছি আগে ওদের সঙ্গে কথাটথা হোক তারপর বলব।

এখনও কথা হয়নি, আজ তাহলে বললে কেন?

জাহিদ সাহেব হাসলেন। ছবির জন্য।

মানে?

তোর আরও দুটো ছবি আমার লাগবে। আমার অফিসের কম্পিউটারে তোর বায়োডাটা আছে। সেখান থেকে একটা প্রিন্ট বের করে নেব। এখন তোর দুটো ছবি হলে দুএকদিনের মধ্যে খান সাহেবকে আবার পাঠাতে পারি।

আমাকে না বলেও তো ছবি নিয়ে নিতে পারতে।

তা পারতাম। আগেরবার ছবি বের করে দিয়েছিল নীলু। সেই ছবি হারিয়ে গেছে শুনে সেও কেমন একটু ভয় পেয়েছে। বললাম, শর্মির অ্যালবাম থেকে আরও দুটো ছবি এনে দে। শুনে বলল, আমি আর পারব না। পরে যখন তোমার মেয়ে সব শুনবে, আমাকে একদম খেয়ে ফেলবে। তখনই ডিসিশান নিলাম তোকে সব বলে দেব। তারপর তোর কাছ থেকেই ছবি চেয়ে নেব।

শর্মি এক চুমুক কোক খেল। তারপর মিষ্টি করে হাসল। এজন্যই আজ এখানে খাওয়াতে নিয়ে এসেছ?

জাহিদ সাহেবও হাসলেন। আরে না।

আমি ঠিকই বুঝেছি। আচ্ছা যাও, ঠিক আছে। ছবি তোমাকে আমি দেব। থ্রিআর সাইজ, পাসপোর্ট সাইজ, যা চাও। আর যদি আমার আগের হারিয়ে যাওয়া ছবি নিয়ে কোন ঝামেলা হয় সেই ঝামেলার জন্য কিন্তু তুমি আর খান আঙ্কেল দায়ী থাকবে।

আচ্ছা ঠিক আছে।

আবার কিছুটা সময় কাটে চুপচাপ। জাহিদ সাহেব খেতে খেতে কেমন উদাস হয়ে যান।

ব্যাপারটা খেয়াল করল শর্মি। বলল, কী ভাবছ বাবা?

অন্য একটা ঘটনার কথা ভাবছি।

কী বলো তো ?

সকালবেলা তোকে আজ বলেছিলাম না, দুটো ঘটনার কথা বলব! একটা তো বলে ফেললাম। তোর বিয়ে ছবি ইত্যাদি। অন্যটাও বলে ফেলি। কেন যে কাল থেকে ঘটনাটা থেকে থেকে মনে পড়ছে। তোর মায়ের মৃত্যুদিন ছিল বলেই হয়তো মনে পড়ছে। তোর মায়ের মৃত্যুদিনের ভোরবেলাই ঘটেছিল ঘটনাটা। সাতবছর আগে। ঠিক ভোরবেলা না, ভোর রাত বলতে পারিস। তখনও ফজরের আজান হয়নি। চারটা পাঁচদশ মিনিট হবে। উত্তরায় আমাদের বাড়ির সামনেই ঘটেছিল।

ইস বাবা, তুমি মাঝে মাঝে এত রহস্য করে কথা বলো। এত সময় নিচ্ছ কেন বলতে। সহজ ভাষায় চট করে বলে ফেললেই তো হয়।

হ্যাঁ বলছি। ভোররাতে হাসপাতাল থেকে ফোন এল, তোর মার অবস্থা বেশ খারাপ। নীলু ছিল তোর মায়ের কাছে। সে কাঁদতে কাঁদতে ফোন করল। ভাইজান, তুমি এক্ষুণি আস। ভাবীর শরীর খুবই খারাপ। ফোন পেয়ে আমি দিশেহারার মতো বাড়ি থেকে বেরিয়েছি। আমাদের তখন গাড়ি নেই। বাড়ি একতলা হয়েছে। দোতলার কাজ চলছে। তোর মার কথায়ই একতলা কমপ্লিট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে এসে উঠেছিলাম আমরা। তাতে সুবিধাই হয়েছিল। বাড়িতে থেকেই বাড়ির কাজ তদারক করতে পারছিলাম। কিন্তু ভোররাতে উত্তরা থেকে ঢাকা মেডিকেলে কেমন করে যাব। তবু দিশেহারার মতো বেরিয়েছি। মেইনরোডে গিয়ে রিকশা স্কুটার যা পাই নিয়ে নেব। ভাড়া যা নেয় দেব। উত্তরা তখন বেশ ফাঁকা এলাকা। এত বাড়ি টারি তৈরি হয় নি। তবে হচ্ছে। এদিক ওদিক তাকালেই আন্ডার কনস্ট্রাকশন বাড়ি দেখা যায় প্রচুর। শার্টের বোতাম লাগাতে লাগাতে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি আমি। কোনও দিকে খেয়াল নেই। দিশেহারার মতো ছুটছি। হঠাৎ দেখি আমাদের বাড়ি বরাবর লেকের পাড়ের আবছা অন্ধকারে দুজন মানুষ একজন আরেকজনকে জড়িয়ে ধরে টালমাটাল পায়ে হাঁটছে। খানিকদূরে গিয়ে লেকের ভাঙনের দিকে নেমে গেল তারা শুধু এটুকুই আমি দেখলাম। তারপর আমার আর কিছু চোখে পড়েনি বা খেয়াল করিনি। স্ত্রী মৃত্যুশয্যায়, হাসপাতাল থেকে ফোন এসেছে, রিকশা স্কুটার পাব কী পাব না জানি না, এই অবস্থায় অন্যকিছু কি আর খেয়াল থাকে! সেদিনই সকালবেলা তোর মা মারা গেলেন। লাশ নিয়ে বাড়ি ফিরলাম দশটার দিকে। আত্মীয় স্বজনরা সবাই এসেছে। কান্নাকাটি বিলাপ চলছে বাড়িতে। ওই দৃশ্যটির কথা আমার আর মনেই নেই। তোর মাকে মাটি দিয়ে ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। বাড়ি ফিরে দেখি লেকের ওদিকটায় লোকজনের জটলা। পুলিশ এসেছে। কী ব্যাপার? লেকের ওদিকটায় একজন আধবুড়ো লোকের লাশ ভাসছে। তার হাত পা শক্ত দড়ি দিয়ে প্যাঁচিয়ে বাঁধা।

শুনে চমকে উঠল শর্মি। বলো কী?

হ্যাঁ। দড়ি দিয়ে বেঁধে লেকে ফেলে দেয়া হয়েছিল তাকে। যাতে নড়তে চড়তে না পারে। একবারেই ডুবে যায়।

তার মানে ভোররাতে তুমি যে দুজনকে আবছা মতন দেখেছিলে তাদের একজন আরেকজনকে এইভাবে মেরেছে ?

হ্যাঁ।

পরে তুমি পুলিশকে ঘটনাটা জানাওনি?

না। কে যায় ওসব ঝামেলায়। পুলিশকে তো নয়ই, কখনই কাউকে ঘটনাটা আমি বলিনি। আজই প্রথম তোকে বললাম।

কেন বললে?

জানি না। বলতে ভাল লাগল। অনেকদিন বুকের ভেতর চেপে ছিল ঘটনাটা। আজ তোকে বলে বুকটা কেমন হালকা লাগছে।

পরে কি লোকটার পরিচয় জানা গিয়েছিল?

তেমন কিছু জানা যায়নি। পাড়ার লোকরা নাকি শুনেছিল লোকটা পুরনো ঢাকার। একসময় মাঝারি ধরনের গুণ্ডা ছিল।

গুণ্ডা কথাটা শুনে শর্মি কেমন যেন স্বস্তি পেল। ও গুণ্ডা ছিল! তাহলে ঠিকই আছে। গুণ্ডারা এইভাবেই মরে।

কিন্তু তখন লোকটা প্রায় বৃদ্ধ। গুণ্ডামি অনেক আগেই ছেড়ে দিয়েছিল।

তাহলে হয়তো কেউ পুরনো শত্রুতার প্রতিশোধ নিয়েছে।

হয়তো তাই হবে।

দুজনেরই খাওয়া শেষ। টিসু পেপারে আলতো করে ঠোঁট মুছল শর্মি। আমি কিন্তু ঘটনাটা শুনে খুব একটা

অবাক হইনি বাবা।

কেন?

আমার কাছে এমন কিছু ঘটনা মনে হয়নি। এরকম ঘটনা অনেক ঘটে।

কিন্তু আমার কাছে ঘটনাটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। হাসপাতালে প্রায় মৃত্যুর কাছে চলে যাচ্ছে আমার স্ত্রী, তাকে শেষ দেখার জন্য ছুটছি, আর ঠিক সেই মুহূর্ত চোখের সামনে দেখছি একজন মানুষ নিঃশব্দে মেরে ফেলছে আরেকজনকে। কিন্তু আমি তা বুঝতে পারছি না।

বাবার চোখের দিকে তাকিয়ে শর্মি বলল, তোমার মনোভাবটা আমি বুঝেছি বাবা। চলো উঠি।

বিল মিটিয়ে ওরা যখন রেস্টুরেন্ট থেকে বেরুচ্ছে, তখন সেই মানুষটার কথা আবার মনে পড়ল শর্মির। আর মাঝখান থেকে মনে পড়ল রবীন্দ্রনাথের একটা গানের লাইন। গোপনে তোমারে সখা...’। কেন যে, শর্মি নিজেও তা জানে না।

শর্মিদের বাড়ি খুঁজে পেতে তেমন সময় লাগল না।

ট্যাক্সিক্যাবের ড্রাইভার ছিল অল্প বয়সী একটা ছেলে। দেখেই বোঝা যায় লেখাপড়া জানা, স্মার্ট। উত্তরা এলাকায় এসে ঠিকানা বলতে প্রায় একবারেই নিয়ে এল বাড়ির কাছে।

কিন্তু বাড়ির একেবারে কাছে আমি নামলাম না। খানিকটা এগিয়ে গিয়ে নামলাম। মিটার দেখে ভাড়া মিটিয়ে দশটা টাকা টিপসও দিলাম। তারপর সিগ্রেট ধরিয়ে প্রথমে শর্মিদের বাড়ির দিকে তাকালাম। ছবির মতো সুন্দর দোতলা বাড়ি। বাড়ির সঙ্গে রাস্তা, রাস্তার ওপারে লেক। লেকের পারে সবুজ ঘাস, নানা রকমের ফুল পাতাবাহারের ঝাড়। আর বেশ অনেকখানি জায়গা ছায়া করে রাখা একটা বকুলগাছ। বসন্তকাল বলে পাতাগুলো যেন একটু বেশি সবুজ। শীতভাব কাটিয়ে সতেজ হয়ে উঠেছে। দুপুর শেষ হওয়া রোদে ঝিমঝিম করছিল চারদিক। হু হু করা একটা হাওয়া বইছিল। সেই হাওয়ায় চারদিক তাকাতে তাকাতে শরীরের খুব ভেতরে কেমন একটা কাঁপন লাগল আমার।

এই জায়গাটাই তো!

সাত বছরে অনেক বদলেছে। বাড়ির পর বাড়ি হয়ে ভরে গেছে লেকের দুপার। বকুলগাছটা তখন শিশু। লেকের পারে ফুল পাতাবাহারের ঝোঁপঝাড় এতটা ছড়ায়নি। পায়ের তলায় ঘাস মাত্র গজাচ্ছিল।

এই জায়গাটাই তো!

শর্মিদের বাড়ির কথাও তারপর মনে পড়ে আমার। মাত্র তৈরি হচ্ছিল। নাকি একতলা হয়ে গিয়েছিল, দোতলার কাজ চলছে। বাড়ির সামনে ইটের পাঁজা, বালি সুরকি রড আর কাঠবাঁশ।

ভেতরে ভেতরে আমি তারপর দিশেহারা হয়ে গেলাম। এতকাল পর নিয়তি আমাকে এ কোথায় টেনে আনল! শর্মির জন্য কোথায় এসে দাঁড়ালাম আমি!

আমার চোখে কি রকম একটা ঘোর লেগে যায়। মন্ত্রমুগ্ধের মতো এদিক ওদিক তাকিয়ে ধীর পায়ে হাঁটতে থাকি আমি।

মনে পড়ে। আমার সব মনে পড়ে।

আমি থাকতাম নানাবাড়িতে। বড়খালার কাছে। নানাবাড়িটা ছিল তিন শরিকের। আমার নানা আর তার দুই ভাই। নানা ছিলেন বড়। আমার জন্মের বহুকাল আগে তিনি মারা যান। নানী মারা যান আমার বড়ভাইয়ের জন্মের কয়েকমাস পর।

আমার কোনও আপন মামা ছিল না। মা-খালারা তিন বোন। বড়খালা নিঃসন্তান, বিধবা। অল্প বয়সে বিধবা

হয়েছেন। স্বামীর দিককার জায়গা সম্পত্তির কিছুই পাননি। থাকতেন বাপের বাড়িতে। তিন শরিকের বাড়িটির দক্ষিণের অংশ আমার নানার। সেখানে অনেকগুলো কামরাঅলা বিশাল একটি টিনের ঘর। পুবপাশে বনেদী ধরনের রান্নাঘর। রান্নাঘরের লাগোয়া দক্ষিণে মাঝারি ধরনের একটা পাটাতন করা ঘর। এই ঘরটি সব সময় তালাবদ্ধ থাকত। থাকার লোক ছিল না।

বড়ঘরটির সামনের দিকে একটি দরজা। সেটা উত্তরমুখী। ওই দরজা দিয়ে বেরুলে উঠোন। উঠোনের দুপাশে মেজো নানা ছোটনানার ঘরদুয়ার। দুই শরিকের মাঝখান দিয়ে উত্তরে বারবাড়ি, তারপর শস্যের মাঠ। বড়ঘরের সামনের দরজায় দাঁড়িয়েই আলমগীর মামাকে মার খেতে দেখেছিলাম আমি। এসব আমার সেই বয়সের কথা।

বড়ঘরের দক্ষিণে ছিল আম জাম আর নিমগাছের বিশাল বাগান। সারাদিন পাখি ডাকত সেই বাগানে। সুনসান নির্জনতায় হু হু করা হাওয়া বইত। এসবের মধ্যে আমরা তিনজন মাত্র মানুষ। বড়খালা আমি আর বাড়ির বহুকালের পুরনো কাজের লোক আলফু।

বিলের দিকে বহু ধানের জমি ছিল নানার। বিক্রি হতে হতে আমার কিশোরকালে পাঁচ সাত কানীতে এসে দাঁড়িয়েছিল সেই জমি। নিজেদের চাষবাশের লোকবল ছিল না বলে জমিগুলো ছিল বর্গা দেয়া। একচাষের জমি। অর্থাৎ বছরে ফসল ফলত একবার। আমন আউসের সঙ্গে তিল কাউনও বোনা হতো। কিছু তিল, কিছু কাউন ভাগে আমরা পেতাম। আর তিনচারজন মানুষের বছর চলার পরও বিশ-পঞ্চাশ মণ ধান বিক্রি করা যেত। সেই টাকায় খালার সামান্য বাজার, তেল নুন দুধ এসব কেনা চলত। শাকসবজি তো বাগানের দিকেই ফলত। লাউ, মিষ্টি কুমড়া, চালকুমড়া সিম. ঝিঙা, কহি নামের বান্দরলাঠি টাইপের লম্বা একটা পানসে ধরনের সবজি, ধুন্দল। বছরভর কোনও না কোনও সবজির মাচা আমাদের বাগানে থাকতই। সেইসবের তদারক করত আলফু আর সংসারের মাছটা ধরত গ্রামের খালবিল পুকুর থেকে। সে এক শান্ত নির্জীব জীবন।

খরালিকালে তিলফুল ফুটত। তিলের মধু নিতে মৌমাছিরা এসে গুণগুণ করত তিলক্ষেতে। কলকের মতো ছোট ফুলের ভেতর ঢুকে যেত মধুর লোভে। আমি আর আলমগীর মামা বাড়ির সামনের বড় ক্ষেতে গিয়ে তক্কে তক্কে থাকতাম কখন মৌমাছি ঢোকে তিলফুলে। ঢুকলেই টুক করে ফুলের মুখটা টিপে ধরতাম। আমাদের দুজনার হাতে দুটো ফুল তার ভেতর শ্বাসরুদ্ধকর মরণযন্ত্রণায় ছটফট করছে মৌমাছি। সেই বন্দিদশায় কোথায় তখন ভয়ঙ্কর মৌমাছির বিষাক্ত হুল!

সেই বয়সেই আমি বুঝে গিয়েছিলাম ঠিকমতো আটকাতে পারলে পৃথিবীর ভয়ঙ্করতম প্রাণীও মুহূর্তেই অসহায় হয়ে যায়। এবং মৃত্যুর চে' বড় অসহায়ত্ব আর কিছুতে নেই। তিলফুলের ভেতর যেভাবে বিষাক্ত মৌমাছি আটকেছি ছেলেবেলায় ঠিক সেইভাবেই সাতবছর আগে আটকেছিলাম প্রায় বৃদ্ধ হয়ে আসা সেলিমগুণ্ডাকে। তিলে তিলে শেষ করা বলতে যা বোঝায় ঠিক তা নয়, তবে শেষ তাকে করেছিলাম। বহু বছর ধরে মনের ভেতর চাপ ধরে থাকা অপমান এবং কষ্ট যন্ত্রণার প্রতিশোধ নিয়েছিলাম।

আচ্ছা 'তিলে তিলে মারা' কথাটা কোত্থেকে এসেছে! কথাটা কি ওই গ্রীষ্মকালীন ফসল তিল থেকে এসেছে! যে তিলে তেল হয়, নাড়ু মোয়া, খাজা এসব হয়! নাকি তিলফুলের ভেতর থেকে মধু নিতে আসা বিষাক্ত হুলের মৌমাছিকে আটকে ধীরে ধীরে শেষ করে ফেলা থেকে এসেছে তিলে তিলে মারা কথাটা!

আমাকে প্রচণ্ড ভালবাসাতেন খালা। এমন ভাল বোধহয় নিজের সন্তানকেও বাসে না মানুষ। খালার সারাক্ষণে উৎকণ্ঠা ছিল আমাকে নিয়ে। আমি কী খাব, কী পরব! কখন ঘুমাব, কখন পড়তে বসব, কখন স্কুলে যাব, কখন মাঠে, সব নিয়েই ভাবনা ছিল খালার। ঘন দুধের সঙ্গে খেজুরে গুড় দিয়ে কাউনের এক দুবাটি ক্ষির করতেন খালা। নিজে কখনও মুখে দিতেন না। কি যে আদর করে খাওয়াতেন আমাকে! আমি ছিলাম তার জান, আত্মা। কিন্তু খালার জন্য আমার তেমন টান ছিল না। তেমন ভালবাসা ছিল না। আমার সব টান ভালবাসা ছিল বাবার জন্য।

কাল সন্ধ্যায় খালা হঠাৎ করে বললেন, আজ বিকেলের লঞ্চে বাবা আসবেন। শোনার পর থেকে আমার ভেতর শুরু হয়েছে অদ্ভুত এক ছটাফটানি। সন্ধ্যেবেলা পড়তে বসে পড়ায় আর মন বসে না। হারিকেনের ম্লান আলোর দিকে উদাস হয়ে তাকিয়ে থাকি। রেকাবিকে দুধভাত নিয়ে মুখে তুলে খাইয়ে দেন খালা, খাবারের দিকে

আমার মন থাকে না। রাতের বেলা খালার বুকের কাছে শুয়ে ঘুম আসে না কিছুতেই। শুধু মনে হয়, কখন সকাল হবে। কখন আসবে আগামীকাল! সকালবেলা মনে হয় কখন দুপুর হবে, দুপুর গড়িয়ে বিকেল। কখন আলফুর সঙ্গে নদীতীরের লঞ্চঘাটে গিয়ে দাঁড়াব। কখন নদীর বাঁকে ছবির মতো আস্তেধীরে ফুটে উঠবে একটা লঞ্চ, ভটভট শব্দে এগিয়ে আসবে ঘাটের দিকে। কাছাকাছি আসার পর দেখা যাবে ডেকের উপর হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছেন বাবা।

বাবার জন্য এই অপেক্ষাটা আমার শুরু হয়েছিল শৈশবে। সেই বয়সেই বুঝে গিয়েছিলাম চারপাশের মানুষের মধ্যে আমি সবচাইতে ভালবাসি আমার বাবাকে। বাবার মতো মায়াবী সুন্দর মুখের মানুষ এই পৃথিবীতে আর কেউ নেই। বাবার মতো ভালবাসতে কেউ জানে না। আমার মা না, বড় ছোটখালা কেউ না, এমনকি আমার ভাইবোনরাও না।

আমার পাঁচটি ভাইবোন। দুভাই তিনবোন। প্রথমে বড়ভাই তারপর দুটো বোন, তারপর আমি তারপর শেষ বোনটি। বাবা চাকরি করেন ওয়াপদায়। কেরানির চাকরি। এই চাকরির আয়ে এতগুলো মানুষের সংসার চলতে চাইত না। মাও সামলাতে পারতেন না। এতগুলো সন্তান। এ জন্যই আমাকে রেখেছিলেন বড় খালার কাছে।

কিন্তু আমার যেমন বাবার জন্য টান ভালবাসা, বাবাও তেমনি। ছেলেমেয়েদের মধ্যে আমাকে তিনি সবচাইতে বেশি ভালবাসতেন। এজন্য ছুটিছাটায় নানাবাড়িতে বাবা আমাকে দেখতে আসতেন। পাশের গ্রামের হাইস্কুলে ক্লাস টুতে আমাকে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলেন।

আমাকে দেখতে এসে এক দুদিনের বেশি থাকতেন না বাবা। যে একটি দুটি দিন থাকতেন, আমি সারাক্ষণ বাবার সঙ্গে। স্কুলে যেতাম না, পড়তে বসতাম না। খেতাম বাবার সঙ্গে, ঘুমাতাম তার গলা জড়িয়ে। আর কত যে কথা বলতাম বাবার সঙ্গে। ওই বয়সের ছেলেমানুষি কথা। এমনকি গান গেয়েও শোনাতাম বাবাকে। লোকমুখে কিংবা মাইক ট্রানজিস্টারে শোনা গান। ‘আমায় এত রাইতে ক্যানে ডাক দিলি, প্রাণ কোকিলারে’।

আসলে এসব ছিল আমার যাবতীয় গুণপনা দিয়ে বাবাকে মুগ্ধ করার চেষ্টা।

বাবা মুগ্ধ হতেন। যখন তখন বুকে জুড়িয়ে ধরতেন আমাকে। মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করতেন।

সেই বয়সে আমার সবচে’ দুঃখের দিন ছিল বাবা যেদিন চলে যেতেন।

চলে যাওয়ার দিন সকালবেলাই বাবার জন্য গরমভাত আর গুড়ামাছের ঝোল রেঁধেছেন খালা। আমাকে নিয়ে খেতে বসেছেন বাবা। কিন্তু আমাদের দুজনার কারোরই গলা দিয়ে ভাত নামে না। বাবার চোখেও পানি আসে, আমার চোখেও পানি আসে।

খাওয়া শেষ করে লাজুক মুখে খালার সামনে দাঁড়ান বাবা। আমার মা এবং ছোটখালার মতো বাবাও বড়খালাকে ডাকতেন ‘বুজি’। লাজুক মুখে তার সামনে দাঁড়িয়ে ম্লান গলায় বলতেন, আপনের কাছে কয়টা টেকা হইব বুজি?

অর্থাৎ যাতায়াত খরচটা বাবার কাছে নেই। আমাকে দেখার লোভে কোনও রকমে লঞ্চ ভাড়াটা জুগিয়ে চলে এসেছেন। ফেরার সময় পকেট ফাঁকা।

ধান বিক্রির টাকা কিছু না কিছু খালার কাছে থাকতই। আলমারি খুলে পাঁচ দশটা টাকা বাবাকে তিনি দিতেন। ওই টাকা পকেটে নিয়ে, আমাকে জড়িয়ে ধরে, মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে পথে নামেন বাবা। বারবাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে কাঁদতে থাকি আমি।

কাঁধে রেকসিনের সস্তা ব্যাগ, বাবা হেঁটে যান আর ফিরে ফিরে তাকান। দূর থেকে আমি দেখি, থেকে থেকে চোখ মুছছেন বাবা।

বর্ষার মুখে মুখে গ্রামের খালপার থেকে ছইঅলা নৌকায় করে লঞ্চঘাটে যান বাবা। আলফু যায় তার ব্যাগ পৌঁছে দিতে। সঙ্গে আমি। কিন্তু নৌকা ছাড়ার পর একদিকে কাঁদেন বাবা আরেক দিকে আমি।

আমার গ্রাম্য জীবনটা কেটেছে এইভাবে। বাবার জন্য কেঁদে।

খালার মৃত্যুর পর আমি ঢাকায় চলে এসেছিলাম। আমি তখন ক্লাস ফাইভ থেকে সিক্সে উঠেছি। খালার মাথায় কি রকম গণ্ডগোল দেখা দিল। সারাদিন বসে বসে কাঁদত। রাত দুপুর বিছানায় বসে বিলাপ করত। কি যে বলত, কার কথা যে বলত আমি কিছু বুঝতেই পারতাম না। কখনও কখনও আমাকে জড়িয়ে ধরেও কাঁদত। জানি না কোথাকার কোন গোপন দুঃখ বেদনা তাকে ভেতরে ভেতরে ঘায়েল করেছিল। শেষ পর্যন্ত গলায় দড়ি দিয়েছিল খালা। বড়ঘরের দক্ষিণ পশ্চিম-কোণের ভাঙনের দিকে ঝুঁকে পড়া আমগাছের ডালে নিজের শাড়িতেই ফাঁস নিয়েছিল।

খালার মৃত্যুতে তেমন বড়রকমের কোনও আঘাত আমি পাইনি। কেন, বলতে পারব না। যদিও খালার স্নেহ মমতার কথা বহুদিন পর্যন্ত মনে পড়েছে। মনটা একটু একটু খারাপ হয়েছে, এরচে' বেশি কিছু না।

ঢাকায় চলে আসার পর বাবার জন্য আমার শুরু হয়েছিল অন্যরকম এক অপেক্ষা। ততোদিনে পাঁচটি ভাইবোন আমরা সবাই বড় হয়েছি। বড়ভাই কলেজে পড়ে, বাকি চারজন স্কুলে। সংসারের খরচ বেড়ে গেছে অনেক। কেরানিগিরির চাকরিতে সংসার কিছুতেই চালাতে পারেন না বাবা। এজন্য অফিসের পর নানা রকমের টুকটাক কাজ করতে হতো তাকে। টিউশনি করতে হতো। সকালবেলা বাসা থেকে বেরিয়ে ফিরতেন অনেকটা রাত করে। দুপুরে খেতেন কি খেতেন না জানতেও পারতাম না।

কিন্তু রাত যত বাড়ত বাবার জন্য উৎকণ্ঠা ততই বাড়ত আমার। পড়তে বসে বাবার জন্য আনমনা হয়ে যেতাম, খেতে বসে আনমনা হয়ে যেতাম। অন্যান্য ভাইবোন যে যার মতো পড়াশুনা, খাওয়া-দাওয়া গল্পগুজব করে শুয়ে পড়ত, বাবার কথা হয়তো ভাবতই না। কিন্তু আমি শুতে পারতাম না। কাউকে কিছু না বলে আমি একা একা চলে যেতাম রাস্তার মোড়ে। বাবার জন্য দাঁড়িয়ে থাকতাম। বাবা কখন ফিরবেন?

অনেকটা রাত করে ফিরতেন বাবা। দূর থেকে সারাদিনের ক্লান্তি নিয়ে বিষণ্ন ভঙ্গিতে হেঁটে আসতেন। আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মায়াবী মুখখানা তাঁর ভরে যেত মোহময় এক হাসিতে।

সংসার চালাবার জন্য তখন প্রায়ই ধার উধার করতে হতো বাবাকে। মাসের শেষদিক থেকে শুরু হতো ধার। মাস মাইনে পেয়ে সেই ধার শোধ করার পর হাতে টাকা-পয়সা বলতে গেলে আর থাকতই না। রেশনের চাল, গম, চিনি, এক দুটাকার প্রতিদিনকার বাজার, খেয়ে না খেয়ে কোনও রকমে চলতাম আমরা।

এই অবস্থায় চাকরি চলে গেল বাবার। কি কারণে গেল বলতে পারব না। এমনিতেই হতদরিদ্র সংসার তার ওপর একমাত্র রোজগারের মানুষটি গেল বেকার হয়ে। আমাদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। এক দুমাসের মধ্যে ধার দেনায় একেবারেই ডুবে গেলেন বাবা।

সেই সময় ঘটল এক ঘটনা।

কোন এক লোকের কাছ থেকে কিছু টাকা ধার করেছিলেন বাবা। বেশ কয়েকমাস হয়ে গেছে শোধ করতে পারছেন না। সেলিম নামের মাঝারি সাইজের একটি গুণ্ডাকে বাবার পেছনে লাগিয়ে দিল সেই লোক। টাকা তুলে দিতে পারলে সেলিমকে কিছু দেবে সে।

সেলিমগুণ্ডা যখন-তখন এসে আমাদের বাসায় হানা দিতে লাগল। প্রথম প্রথম বাসায় থেকেও না করে দিতেন বাবা। তারপর সেলিমগুণ্ডার শব্দ পেলেই পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যেতেন।

কিন্তু এভাবে কতদিন?

সেলিমগুণ্ডার হাতে একদিন ধরা পড়ে গেলেন বাবা।

তখন বাবার জন্য সারাক্ষণের উৎকণ্ঠা আমার। বাবা কোথাও গেলেই আমার মধ্যে শুরু হয় এক ছটফটানি। বাবা ফিরে না আসা পর্যন্ত কোনও কাজই করতে পারি না। স্কুলে গিয়ে ক্লাস করতে পারি না, খেলতে গিয়ে উদাস হয়ে মাঠের কোণে বসে থাকি। রাতের বেলা রাস্তার মোড়ে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাবার জন্য দাঁড়িয়ে থাকি।

সেলিমগুণ্ডার ভয়ে নিজের বাসায় বাবা তখন ফিরতেন চোরের মতো। এক পীর সাহেবের মুরিদ হয়েছিলেন, তার ওখানে যেতেন ফজরের আজানের সঙ্গে সঙ্গে। আলো ফুটবার আগেই সেখান থেকে বেরিয়ে রোজগারের আশায় এদিক ওদিক চলে যেতেন।

এই করেও রেহাই পাননি বাবা। একদিন সকালবেলা সেলিমগুণ্ডা তাকে ধরে ফেলল। ফজরের নামাজ পড়ে হুজুরের ওখানে কিছুটা সময় কাটিয়ে কোনও কাজে বোধ হয় বাসায় ফিরছিলেন তিনি। ওই পথে সেলিমগুণ্ডার আড্ডা। বাবা ভেবেছেন এত সকালে নিশ্চয় সে থাকবে না। রাতভর মদটদ খেয়ে মাতাল হয়েছে, উঠবে নিশ্চয় বেলা করে।

কিন্তু ধারণাটা ভুল হয়েছিল বাবার। অন্য কোথাও রাত কাটিয়ে ঠিক সেই সময়টাতেই বাড়ি ফিরছিল সেলিমগুণ্ডা। বাবা তার মুখোমুখি পড়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেলিমগুণ্ডা তার বুক এবং কোকসা বরাবর দুটো ঘুষি মারল। এমনিতে চাকরি নেই, পাঁচটি ছেলেমেয়ে নিয়ে খেয়ে না খেয়ে দিন কাটে। বাড়িভাড়া বাকি পড়েছে অনেক মাসের, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় বাবার শরীরে কিছু ছিল না। সেলিমগুণ্ডার ঘুষি খেয়ে রাস্তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন তিনি।

ওই পথে একটা বটগাছ ছিল। বটতলার টংঘরে পান বিড়ি সিগ্রেটের দোকান চালাতো মোটা মতন একটা ঢাকাইয়া বুড়ি। বাবাকে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে সেই ঘরে বসিয়ে রাখল সেলিমগুণ্ডা। আমাদের বাসায় ছোট্ট একটা ছেলে এসে খবর দিল টাকা না দিলে বাবাকে ছাড়বে না সেলিমগুণ্ডা। মারের কথাটা বলল না।

বাবাকে আটকে রেখেছে শুনে মা খুবই দিশেহারা হলেন। বোনগুলোর মুখ শুকিয়ে গেল। বড়ভাই মুখ গোঁল করে বসে রইলেন আর আমি পাগলের মতো ছুটে বেরিয়ে গেলাম।

আমার বড়ভাই বাবাকে তেমন পছন্দ করত না। আর ছেলেবেলা থেকেই একটু যেন দায়িত্ব এড়ানো টাইপের। নিজের স্বার্থ ছাড়া বিশেষ কিছুই বুঝতে চায় না। সেলিমগুণ্ডার হাতে ধরা পড়েছে বাবা এতে যেন মান সম্মান তার একেবারেই ধ্বংস হয়ে গেছে এমন একটা মুখ করে বাসা থেকে বেরিয়ে বোধহয় বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আড্ডা দিতে চলে গিয়েছিল সে।

যাহোক সেই দোকানটির সামনে ছুটে এসে দেখি মলিন পাজামা পাঞ্জাবি পরা আমার অসহায় বাবা চিরকালীন দুঃখী মানুষের মুখ করে বসে আছে। পাঞ্জাবির একদিককার কুনইয়ের কাছে ধুলো ময়লা একটা আস্তর লেগে আছে।

বাবার মুখ দেখে বুকটা হু হু করে উঠল আমার। পাশের চায়ের দোকানের বাইরের বেঞ্চে বসে চায়ে পরোটা চুবিয়ে চুবিয়ে খাচ্ছে সেলিগুণ্ডা আর আড়চোখে বাবাকে দেখছে। অর্থাৎ পাহারা দিচ্ছে।

একপলক সেলিমগুণ্ডাকে দেখে বাবার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। আমি কথা বলবার আগেই ম্লান গলায় বাবা বললেন, আফতাব মিয়ারে একুট ডাইকা আনো বাজান।

আফতাব মিয়া আমাদের বাড়িঅলা। একসময় খুবই সম্মান করত বাবাকে। অনেকটা জোর করেই নিজের এই বাড়িটা ভাড়া দিয়েছিল বাবাকে। কারণ তখন সে ওয়াপদার টুকটাক সাপ্লাইয়ের কাজ করত। বাবার সাহায্য দরকার ছিল তার। কিন্তু চাকরি চলে যাওয়ার পর বাবাকে সে আর পাত্তা দেয় না। ভাড়া বাকি পড়েছে বলে যখন-তখন এসে কথা শুনিয়ে যায়। উঠে যেতে বলে, জোর করে তুলে দেয়ার হুমকি দেয়। একই মানুষের যে কত রকমের চেহারা হতে পারে, এই আফতাব মিয়াকে দেখে আমি তা প্রথম বুঝেছিলাম। প্রয়োজনের সময় কী যে তোয়াজ করত বাবাকে। আর বাবার অসময়ে বাড়িভাড়ার জন্য কত অপমান করেছে তাকে।

সেই আফতাব মিয়াকে বাবা কেন ডেকে আনতে বলছেন?

পরে বুঝলাম আফতাব মিয়া সেলিমগুণ্ডার খুবই পরিচিত। সে এসে বললে বাবাকে সেলিম ছেড়ে দেবে। টাকা কবে দেবে সেসব বিষয়ে একটা সমঝোতা করিয়ে আফতাব মিয়া নিশ্চয় বাবাকে ছাড়িয়ে নেবে।

আমি দিশেহারার মতো আফতাব মিয়ার বাড়ির দিকে ছুটছি। দোকানের মোটা বুড়িটা হাতের তালুতে পানের টুকরো নিয়ে খয়ের লাগাতে লাগাতে হায় আফসোসের গলায় ফিসফিস করে বলল, আহা রে, যেই দুইডা ঘুষা

বেডারে মারছে!

শুনে পা থেমে গেল আমার, মুহূর্তের জন্য মাথাটা কেমন ঘুরে উঠল। বুঝে গেলাম কি কারণে বাবার পাঞ্জাবির কনুইয়ের কাছে ধুলো ময়লা চাপড় লেগে আছে।

বাবা আবার বললেন, তুমি যাও বাজান।

কিন্তু বাবাকে ছাড়াতে সেদিন আসেনি আফতাব মিয়া। উল্টো আমাকে বলল, দুই চাইরদিনের মইদ্যে বাড়িভাড়ার টেকা না পাইলে সেলিমগুণ্ডার লগে আমারও কনটাক করণ লাগব। অরে দিয়া ঐ টেকাডা উডান লাগব।

আমি আবার দৌড়ে এলাম বাবার কাছে।

বাবা অসহায় গলায় বললেন, আইল না?

না।

সেলিমগুণ্ডা তখনও সেই চায়ের দোকানের সামনে বসা। ফুক ফুক করে সিগ্রেট টানছে। তার দিকে তাকিয়ে আমার বুকের ভেতর তোলপাড় করছে বিশাল এক ক্রোধ। ওই লোকটা মেরেছে আমার বাবাকে! আমি যদি ওর বয়সী হতাম, গায়ের জোর ওর মতো থাকত বা না থাকত ওকেও আমি মারতাম। ও আমার বাবাকে দুটো ঘুষি মেরেছে, আমি ওকে গজারি লাকড়ি দিয়ে বেদম পিটাতাম। পিটিয়ে একেবারে মেরে ফেলতাম। তবে আমি সেলিমকে একদিন মারবই। আজ হোক, দশ বিশবছর পরে হোক, আমার বাবার গায়ে হাত তোলার প্রতিশোধ আমি নেবই।

তারপর থেকে প্রতিশোধ না নেয়া পর্যন্ত একটি মুহূর্তের জন্যও ঘটনাটি আমি ভুলতে পারিনি। সময়ে অসময়ে, ঘুমে জাগরণে আমি কেবল দেখে সেই টংঘরে বসে থাকা, খেয়ে না খেয়ে কোন রকমে বেঁচে থাকা, বুকের পাঁজরে এবং কোকসায় ঘুষি খাওয়া আমার অসহায় বাবার মুখ। আমার বুক জ্বলে গেছে। সেই জ্বলুনি কমেছে সাত বছর আগে। সেলিমগুণ্ডাকে মেরে প্রতিশোধ নিতে একুশ বছর সময় লেগেছিল আমার।

যাহোক সেদিন শেষপর্যন্ত সেলিমগুণ্ডার হাত থেকে বাবাকে ছাড়িয়ে এনেছিলাম আমি নিজে। বুকের বিশাল ক্রোধ চেপে রেখে সেলিমগুণ্ডার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। আমার বাবারে আপনে ছাইড়া দেন। সামনের মাসের সাত তারিখে আপানের টেকাডা আমরা দিয়া দিমু।

কোত্থেকে টাকা দেব, কেমন করে দেব কিছুই জানি না, তবু বললাম। শুনে সেলিমগুণ্ডা চিন্তিত চোখে আমার মুখের দিকে তাকাল। খানিক তাকিয়ে থেকে বলল, ঠিক তো?

ঠিক।

যদি না দেছ?

দিমুঐ।

আমার গলায় কি ছিল কে জানে। সেলিম আচমকা বলল, আইচ্ছা যা। তয় সাত তারিখে এই দোকানের সামনে আইয়া টেকাডি দিয়া যাবি।

আইচ্ছা।

বাবাকে নিয়ে তারপর বাড়ি ফিরেছিলাম আমি। বাবা এবং আমি ছাড়া কেউ জানতে পারেনি কি অপমান বাবাকে সেলিমগুণ্ডা করেছিল। সবাই জেনেছিল বাবাকে শুধু আটকে রাখা হয়েছিল।

কিন্তু সাত তারিখের টাকা?

সমস্যাটা মিটিয়েছিলেন ছোটখালা। তিনি বেশ অবস্থাপন্ন। আমার খালু ব্যবসায়ী মানুষ। কিন্তু টাকা পয়সার ব্যাপারে অতিশয় খচ্চর। একটি টাকা কাউকে ধার দেয়ার মধ্যে নেই, দুটি টাকা কাউকে সাহায্য করেন না।

বিয়ের পর খালাও তো স্বামীর মতো হয়ে গেছেন। তবু ছোটখালার কাছে গিয়েছিলেন মা। টাকা ধার চাইতে না, বাপের সম্পত্তি তার ভাগে যেটুকু আছে সেটুকু ছোটখালা যদি কিনে নেন। যদি তিনি না কেনেন তাহলে ভাগ বাটোয়ারা করে মার অংশটা যতদ্রুত সম্ভব বুঝিয়ে দিলে অন্য কারও কাছে বিক্রি করে ফেলবেন মা।

নানার জায়গা সম্পত্তির মালিক আমার মা-খালারা তিনবোন। নানার কোন ছেলে ছিল না বলে তার ভাইরাও কিছুটা অংশ পেতেন। 'বেরাদারি হক' না কি যেন বলে ব্যাপারটাকে। বড়খালা বেঁচে থাকতে আমার বাবা উদ্যোগী হয়ে এই সমস্যাটা মিটিয়েছিলেন। সুতরাং এখন বিলের জমি এবং বসতবাড়ি, বাড়ির দুখানা ঘরের একচ্ছত্র মালিক আমার মা খালারা। বড়খালা মারা গেছেন, তার অংশের ভাগও পাবেন মা এবং ছোট খালা।

ছোটখালার কাছে গিয়ে অদ্ভুত একটা তথ্য জানা গেল। বড়খালা মারা যাওয়ার আগে ছোটখালা যে একবার গ্রামে গিয়েছিলেন তখন নাকি বড়খালা তাকে বলেছিলেন তার জায়গা সম্পত্তির ভাগ আমাকে দিয়ে যাবেন। যেহেতু তার কোন ছেলেমেয়ে নেই, আমার প্রতিপালন করেছেন তিনি, আমিই নাকি তার ছেলে। শুনে আমাদের গরিব সংসারে আনন্দের বন্যা বয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু একটা কথা ভেবে আমার খুব অবাক লাগে। স্বামীর সংসারে গিয়ে স্বামীর চরিত্র ধারণ করার পরও এই কথাটা কেন বলেছিলেন ছোটখালা? চেপে গেলেই তো পারতেন। চেপে গেলে বড়খালার অংশের অর্ধেক ভাগ পেতেন তিনি। বেশ কিছু টাকা হতো তার।

আসলে মানুষের মনোজগৎ বড় অদ্ভুত। কত যে রহস্য সেখানে।

ছোটখালা তারপর আমার মায়ের এবং মৌখিকভাবে পাওয়া আমার অংশ কিনে নিয়েছিলেন। বাজার দর অনুযায়ীই কিনেছিলেন। এককালীন বেশ কিছু টাকা পেলাম আমরা। সেই টাকায় সেলিমগুণ্ডার ধার শোধ করা হলো সাত তারিখে। আফতাব মিয়ার বাড়িভাড়া শোধ করা হলো। সংসারের চেহারা ঘুরে গেল।

এসবের কয়েক মাস পর ওয়াপদার পুরনো চাকরিটাও ফিরে পেয়েছিলেন বাবা। তাকে অন্যায়ভাবে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দেয়া হয়েছে এই মর্মে একটা কেস করেছিলেন তিনি। কেসে জিতে গেলেন। পঁচিশ মাস পর পুনর্বহাল হলেন এবং পঁচিশ মাসের পুরো বেতনটা এককালীন পেয়ে গেলেন। আমাদের সংসার সুখে ভাসতে লাগল।

কিন্তু আমার মনের ভেতর খোদাই হয়ে আছে সেই দিনটি, মার খাওয়া বাবার অসহায় মুখটি। যখন-তখন ইচ্ছে করে সেলিমগুণ্ডাকে গিয়ে টিপে ধরি, মুখের ভেতর থেকে জিহ্বাটা ওর হ্যাচকা টানে ছিঁড়ে আনি, আর নয়তো ঘুষাতে ঘুষাতে রাস্তায় ফেলে দিই জারজটাকে। জুতোপরা পায়ে চেপে ধরি গলা। আমার পায়ের তলায় মরণযন্ত্রণায় কাতরাক শুয়োরের বাচ্চা।

বুকের ক্রোধ বুকে চেপে দিন কাটে আমার।

আমি তখন আস্তেধীরে বড় হচ্ছি। কিশোর থেকে যুবক হয়ে উঠছি। রাস্তাঘাটে কখনও কখনও দেখা হয় সেলিমগুণ্ডার সঙ্গে। টের পাই আমার বুকের ভেতর আড়মোড় ভাঙছে একটা সিংহ। তক্ষুণি গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে সেলিমগুণ্ডার ঘাড়ে।

না এইভাবে না। আমি প্রতিশোধ নেব অন্যভাবে। গায়ের জোরে নয়, বুদ্ধি দিয়ে। ছেলেবেলায় যেমন প্রতিশোধ নিয়েছিলাম আলমগীর মামার ওপর।

সাত তারিখে টাকা পেয়ে যাওয়ার পর থেকে ওই অতটুকু আমার ওপর কেমন একটা সমীহের ভাব তৈরি হয়েছিল সেলিম গুণ্ডার। রাস্তাঘাটে দেখা হলে আমার সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলত সে। কী মিয়া, খবর কি? ভালা আছ?

আমি হুঁ হ্যাঁ করে জবাব দিতাম, পা চালিয়ে হেঁটে যেতাম। বুকটা জ্বলত। কবে সেইদিন আসবে। কবে তোকে আমি দেখে নেব কুত্তারবাচ্চা।

দেখে সেলিমগুণ্ডাকে আমি ঠিকই নিয়েছিলাম। একুশ বছর পর। তখন সে প্রায় বৃদ্ধ। চারদিক থেকে প্রচণ্ড মার

খাওয়া নেড়ি কুকুরের মতো অবস্থা। দেখা হলে ভিখিরির মতো পাঁচ দশটি টাকার জন্য হাত পাতে। টাকা পেলে বাংলা মদ খেয়ে রাস্তাঘাটে পড়ে থাকে।

এই সুযোগটা আমি নিয়েছিলাম। বদ্ধ মাতাল করে এক ভোররাতে তাকে নিয়ে এসেছিলাম এখানটায়। পকেটে ছিল শক্ত নাইলনের দড়ি। সেই দড়ি দিয়ে প্যাঁচিয়ে প্যাঁচিয়ে যখন তার হাত পা বাঁধছি, গুণ্ডাটা তখন এতই মাতাল, শব্দ পর্যন্ত করতে পারছিল না। তারপর আমি তার মুখে গুঁজে দিয়েছিলাম রুমাল। লেকের ধারে নিয়ে আলতো করে ঠেলে দিয়েছিলাম। ভারি পাথরের মতো লেকের পানিতে গিয়ে পড়েছিল সে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে আমার বুকে একুশ বছর ধরে চেপে থাকা ক্রোধের ভারি পাথরটিও আস্তেধীরে গড়িয়ে গিয়েছিল কোন অনন্তে। বুকটা হালকা হয়ে গিয়েছিল আমার। ভুলে গিয়েছিলাম সব। সাত বছর পর আজ এখানটায় এসে আবার সব মনে পড়ল।

বুকলগাছটার তলায় দাঁড়িয়ে সিগ্রেট ধরালাম। কখন যে বিকেল হয়ে এসেছে টের পাইনি। সিগ্রেট টানতে টানতে শর্মিদের বাড়ির দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলি, শর্মি তুমি কোথায়?

বাড়ি ফিরে বেশ ভাল রকমের একটা ঘুম দিয়েছে শর্মি।

বিকেল শেষ হয়ে আসছে দেখে নিলু ফুফু এসে ঢুকলেন শর্মির রুমে। কীরে, আর কত ঘুমাবি। শর্মি, শর্মি।

শর্মি চোখ মেলে তাকাল আড়মোড় ভেঙে বলল, কী হয়েছে?

উঠবি না?

এককাপ চা হাতে নিয়ে এসে ডাকতে!

বাপরে! আল্লাদ দেখি একেবারে উথলে উঠছে!

দাওনা ফুফু এককাপ চা।

তাতো দেবোই। এজন্য ডাকছি। ওঠ। উঠে চাটা খা।

টা খাব না। শুধু চা।

কেন? বিকাল বেলা নাশতা খাবি না?

না শুধু চা। বাবার সঙ্গে চাইনিজ খেয়ে পেট এখনো ভরে আছে।

আচ্ছা ঠিক আছে। উঠে হাত মুখ ধো, চা পাঠাচ্ছি।

নীলুফুফু চলে যাওয়ার পরও অলস ভঙ্গিতে কিছুক্ষণ শুয়ে রইল শর্মি, তারপর উঠে হাতমুখ ধুয়ে বেরিয়েছে। তখুনি চা নিয়ে এলো মোবারক। চায়ের কাপ হাতে নিয়ে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল শর্মি। আনমনা ভঙ্গিতে চায়ে চুমুক দিতে গিয়েই চমকে উঠল।

ওটা কে?

কে দাঁড়িয়ে আছে বকুল গাছটার তলায়?

হাতে সিগ্রেট জ্বলছে। থেকে থেকে টান দিচ্ছে সিগ্রেটে কিন্তু চোখ শর্মির জানালার দিকে। নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে আছে। এদিকে।

চায়ে চুমুক দিতে ভুলে গেল শর্মি।

এ কী করে সম্ভব?

শর্মিকে খুঁজতে খুঁজতে এতদূর চলে এসেছে সে!

নিশ্চয় ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে পায়নি...

কিন্তু শর্মিদের বাড়ির ঠিকানা সে কোথায় পেল?

এসময় আবার এলো মোবারক। আফা একটা কথা আপনেরে কইতে ভুইলা গেছি।

চমকে মোবারকের দিকে তাকাল শর্মি। কী কথা?

আপনের মামাতো ভাই ফোন করছিল।

কোন মামাতো ভাই?

তা কয় নাই। ফুবু আম্মারে ডাকতে গেছি, হেয় আইসা ফোন ধরনের আগেই ফোনডা মনে হয় কাইট্টা গেছে।

তারপর আর ফোন করেনি?

না।

শর্মি চিন্তিত হলো। আচ্ছা ঠিক আছে। তুই যা।

মোবারক চলে যাওয়ার পর আবার বকুল গাছটির দিকে তাকাল শর্মি মানুষটাকে দেখতে পেল।

সেও ততক্ষণে দেখে ফেলেছে শর্মিকে। মুখটা একটু উঁচু করে তাকিয়ে আছে শর্মির দিকে। হাতের সিগ্রেট বোধহয় শেষ হয়ে গেছে। নিশ্চয় এই ফাঁকে ফেলে দিয়েছে।

মানুষটাকে এভাবে দেখে যে ধাক্কা শর্মি খেয়েছিল, ধাক্কাটা এখন সয়ে গেছে।

শর্মি চায়ে চুমুক দিয়ে কে ফোন করেছিল সেকথা তার আর মনে পড়ল না, পড়ল অন্য একটা কথা। সে তো আজ এরকম একটা দৃশ্য কল্পনা করেছিল, যখনই বাবা তাকে ইউনিভার্সিটিতে যেতে দেননি, চাইনিজ খাওয়াতে নিয়ে গেছেন তখন থেকেই যখন তখন এই মানুষটির কথা মনে পড়েছে শর্মির। মনের খুব ভেতর থেকে সে একসময় চেয়েছেও মানুষটি এইভাবে তাদের বাড়ির সামনে চলে আসুক।

এসে ওই বকুল গাছটির তলায় তার জন্য, তার জানালার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকুক।

এখন তো ঠিক এমনই ঘটছে।

এই ব্যাপারটাকে কী বলে?

টেলিপ্যাথি!

মনের ডাক মনের শুনতে পাওয়া!

কিন্তু শর্মির সঙ্গে তার কী সম্পর্ক?

সে শর্মির কে?

দূরের মানুষের সঙ্গে, অপরিচিত মানুষের সঙ্গে কি টেলিপ্যাথি হয়?

কিন্তু শর্মির কি সে অপরিচিত?

বেশ কিছুদিন ধরে শর্মি তাকে দেখছে, সে দেখছে শর্মিকে, শুধু কথা হয়নি। কথা না হলে কি কেউ কারো পরিচিত হয় না!

চোখের দেখা পরিচয়ে কি টেলিপ্যাথি হয়?

এসব ভাবতে ভাবতে কোন ফাঁকে চা শেষ হয়ে গেছে শর্মির।

মানুষটা এখনো সেভাবেই দাঁড়িয়ে আছে। অপলক চোখে তাকিয়ে আছে শর্মির দিকে।

শর্মি এখন কী করবে?

জানালাটা বন্ধ করে দেবে?

নাকি এমনভাব করবে যেন মানুষটাকে সে দেখতেই পায়নি, অথবা দেখতে পেয়েও চিনতে পারেনি। কে এসে দাঁড়িয়ে আছে বাড়ির সামনের বকুল তলায় তা নিয়ে শর্মি কেন ভাববে? যে কেউ হতে পারে। শর্মির তাতে কী এসে যায়!

না, এই ভাবনাটা শর্মি ভাবতে পারছে না। সে তো জানেই মানুষটা তার জন্যই এসেছে। তাকে ইউনিভার্সিটিতে না পেয়ে...

শর্মির মনে আবার সেই প্রশ্নটা এলো।

বাড়ির ঠিকানা সে পেলো কোথায়?

বকুলতলায় গিয়ে মানুষটার সঙ্গে কী কথা বলবে শর্মি!

জানার চেষ্টা করবে সব।

কিন্তু বাড়ির কেউ যদি দেখে ফেলে!

দেখলে কী হয়েছে? বানিয়ে একটা কিছু বলে দেবে শর্মি।

নাকি শর্মি যাবে না!

যেমন দাঁড়িয়ে আছে সে দাঁড়িয়ে থাক। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে নিশ্চয়ই একসময় ফিরে যাবে। কাল ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে যদি দেখে সেখানেও এসেছে তখন না হয় কথা বলবে!

কিন্তু শর্মির মনের ভেতরটা কেমন করে?

আহা এতদূর ছুটে এসেছে সে তার জন্য! আর সে কী না দেখেও...।

নাকি এভাবেই চলতে থাকবে আরো কিছুদিন। দেখা হলেও কথা সে বলবে না। ইউনিভার্সিটি হোক, বাড়ির সামনের বকুলতলা হোক, যেখানেই আসুক সে, যত ইচ্ছা ফলো করুক শর্মিকে, সে এগিয়ে এসে কথা বলার সাহস না দেখালে শর্মি কেন গায়ে পড়ে কথা বলতে যাবে তার সঙ্গে?

এসব ব্যাপারে মেয়েরা কী আগে কথা বলে!

ধুৎ! আজকালকার দিনে এসব আগে-পরে কোনো ব্যাপার হলো? আমার ইচ্ছা আমি আগে কথা বলবো, তার ইচ্ছা হয়নি সে আগে বলেনি!

শর্মি তবুও খানিক আরষ্ট হয়ে থাকে। তারপর আর কিছু না ভেবে বাড়ি থেকে বেরোয়। হন হন করে হেঁটে মানুষটার সামনে এসে দাঁড়ায়।

শর্মিকে নয়, যেন জীবনের শ্রেষ্ঠতম স্বপ্নটা মাহী দেখছে এমন ভঙ্গিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। চোখে পলক পড়ে না।

শর্মিও ঠিক অমন চোখেই তাকায় মাহীর দিকে। কী চান আপনি?

মাহী একটু নড়ে ওঠে। চোখে পলক পড়ে তার। তোমাকে।

জ্বি?

আমি তোমাকে চাই।

আপনি কি পাগল?

প্রেমিকরা পাগলই হয়।

এবার যেন বাস্তবে ফেরে। এসব ঠিক নয়। এসব খুব বাড়াবাড়ি।

বাড়াবাড়ি করতে আমি চাইনি। ইউনিভার্সিটিতে তোমাকে না পেয়ে ফোন করেছিলাম। ফোনেও না পেয়ে...।

তার মানে আমার মামাতো ভাই পরিচয় দিয়ে ফোনটা ...।

আমি করেছিলাম।

আমাদের ফোন নাম্বার, বাড়ির ঠিকানা এসব আপনি পেলেন কোথায়?

বলব, সব তোমাকে আমি বলব। তুমি কি আমার সঙ্গে একটু হাঁটবে, একটু কথা বলবে?

কিন্তু আপনি আমাকে তুমি তুমি করে বলছেন কেন?

প্রেমিকরা তো এভাবেই বলে। তুমিও আমাকে তুমি বলো।

শর্মি এবার কী রকম একটু ভয় পেয়ে গেলো। আপনি সত্যি সত্যি পাগল নন তো?

তোমার মনে হচ্ছে?

কথা শুনে মনে হচ্ছে, আচরণে মনে হচ্ছে না। তবে পৃথিবীতে তো অনেক রকমের পাগল আছে ...।

না, আমি খুব সুস্থ স্বাভাবিক একজন মানুষ। তবে তোমার প্রেমে পাগল হয়েছি। প্রেমে পড়লে যে মানুষ সত্যি সত্যি পাগল হয় তার প্রমাণ আমি। আমার যেটুকু পাগলামি, শুধু তোমার জন্য।

কিন্তু এভাবে কি এসব হয়? এভাবে কি কেউ বলে?

কীভাবে বলতে হয় আমি জানি না। তোমাকে দেখার পর থেকে অনেক ভেবেছি। আজ তুমি এসে সামনে না দাঁড়ালে বলতে হয়তো আরো অনেক দিন লাগতো। কিন্তু যখন বলতাম তখন মনে হয় এভাবেই বলতাম।

আবার আগের মত করে শর্মির চোখের দিকে তাকাল মাহী। তুমি কি একটু থাকবে আমার সঙ্গে? একটু হাঁটবে ওই লেকের পাশটায়?

শর্মিও আগের মতো করেই তাকাল তার দিকে। তারপর স্নিগ্ধ গলায় বলল, চলুন।

বিকেল ফুরিয়ে আসা আলোয় অচেনা একজন মানুষের সঙ্গে হাঁটতে লাগল শর্মি। তার একবারও মনে হলো না, মানুষটি বিপজ্জনক। যে কোনো বিপদে তাকে সে ফেলতে পারে। বরং মনে হলো শুধু এই মুহূর্তের জন্য নয়, সারাজীবনের জন্যই মানুষটির ওপর সে ভরসা করতে পারে।